রামজন্মভূমি বনাম বাবরি মসজিদ : একটি ইতিহাস-বিরোধী বিতর্ক

গৌতম নিয়োগী

উপক্রমণিকা

ভূমিকাস্বরূপ বর্তমান প্রবন্ধের প্রথমেই কতকগুলি কথা স্পষ্ট ক'রে নেওয়া ভালো। রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি বেশ কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে যে সাম্প্রদায়িক জিগির সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং এক ধরনের ধর্মীয় উন্মাদনাকে কাজে লাগিয়ে সংহতি, ঐক্য ও প্রগতির প্রচেষ্টাকে বিনষ্ট ও রুদ্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে, তা ঘটছে ভারত-ইতিহাসকে অনেকাংশে সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা ও বিকৃত করার ফলে। এই ইতিহাসবিরোধী মনোভাব এবং বিকৃতি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গ্রহণ করছেন ভারতের প্রধান দুই ধর্মসম্প্রদায় বা হিন্দু-এবং ইসলাম-ধর্মাবলম্বী মানুষদের সেই অংশ, যাঁরা বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিবাদী, গণতান্ত্রিক, উদার, অসাম্প্রদায়িক ও সেকুলার, মানবতাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদে বিশ্বাসী নন। এক কথায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবেই ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রথমেই আরো স্বীকার করতে হবে যে, বর্তমানের এই বিরোধ শুধুমাত্র ইতিহাসের সাক্ষ্য-প্রমাণ বা ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে নি, বরং ভালোভাবে খতিয়ে দেখলে ভারতীয় রাজনীতিতে এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধুনা যে সাম্প্রদায়িক তামসিকতার গভীর প্রভাব পড়েছে, সেই বৃহত্তর পটভূমিকার থেকেই এই বিরোধের জন্ম। তবে, ইতিহাসব্যাখ্যা বিকৃত হলে সমাজে তার কুফল পড়ে এবং তার মাশুল গুনতে হয় জনগণকেই; তাই সমাজে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব বিস্তারে ভারত-ইতিহাসের সাক্ষ্যপ্রমাণ কী ভূমিকা নিয়ে থাকে তা খোলা মনে, নির্মোহ ও অনাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যালোচনা করা দরকার। অতএব এ প্রবন্ধ বিতর্কের তার্কিক জবাব বা ঐতিহাসিক সমাধান নয়, রাজনৈতিক সমাধান তো নয়ই; কেননা বৃহত্তর পটভূমিকা এখানে আলোচ্য নয়, আলোচ্য শুধু ইতিহাস।

দ্বিতীয়ত, পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং পরস্পরকে জানা ও বোঝার দায় যেমন সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু উভয় সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষদের, রাজনৈতিক সমাধানের দায় যেমন রাজনৈতিক দলগুলির, মৌলবাদকে প্রতিহত করার কর্তব্য যেমন সেকুলর ও বস্তুবাদী সংগঠনগুলির, দেশের প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার এবং নিরাপত্তা এবং দেশের সংহতি-ঐক্য-স্বাধীনতা রক্ষার ভার যেমন সরকার ও প্রশাসনের, তেমনি পেশাদার ঐতিহাসিকদেরও কিছু দায়িত্ব আছে, বিশেষত যাঁরা ইতিহাসের ধর্মনিরপেক্ষ, বিজ্ঞানসম্মত ও বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী। ক্ষমতা ও রাজনীতির দ্বন্দ্বে কিছু ভেদপন্থী, চতুর, সংকীর্ণ, স্বার্থান্ধ এবং মতলববাজ দল বা গোষ্ঠী যদি সাধারণ মানুষদের ধর্মীয় সারল্য, গভীর ধর্ম-বিশ্বাস এবং মনের আবেগকে ইতিহাসের দোহাই দিয়ে আইনসিদ্ধ করার চেষ্টা করে বা তাদের বক্তব্যকে ইতিহাসনিষ্ঠ বলে চালাবার চেষ্টা করে, তখন স্বভাবতই ঐতিহাসিকদের একটা দায় থাকে সেই বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করবার।

ইতিহাসবিদের পক্ষে সত্য ঘটনা তুলে ধরা আবশ্যিক কর্ম হিসেবে একান্ত জরুরি হয়ে পড়ে তখনই, যখন ক্ষমতালোভী এবং স্বার্থপর সাম্প্রদায়িক শক্তি বা গোষ্ঠী নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য 'ইতিহাসের সাক্ষ্য'কে বিকৃত করে ব্যবহার করতে চায়। তাই, ঠিক এই যুক্তিতেই, বর্তমান প্রবন্ধটি রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ প্রশ্নটি কতখানি ইতিহাসসম্মত বা ইতিহাসসম্মত আদৌ নয়, তা দেখানোর একটা আন্তরিক ও সহজ চেষ্টা মাত্র। দেশের অনেক যোগ্য ইতিহাসবিদ একক বা সমবেতভাবে আগেই এ কাজ করেছেন, এই প্রচেষ্টা তারই সঙ্গে সামান্য সংযোজন—তা আমরা সবিনয়ে জানাতে চাই।

তৃতীয়ত, কোনো ধর্মমত বা সম্প্রদায় বা দল কিংবা গোষ্ঠী বা কোনো ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাসকে সামান্যতম আঘাত দেওয়া এই প্রবন্ধের অভিপ্রায় নয়। আমাদের প্রতিবাদ ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, অসহিষ্ণু অগণতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে, অযৌক্তিক উন্মাদনার বিরুদ্ধে এবং অবশ্যই ইতিহাসের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে। ভারতবর্ষ সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে প্রত্যেক নরনারীর তাঁর নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসের, সেই বিশ্বাস অনুযায়ী আচরণের এবং ব্যক্তিগত ধর্মপালনের মৌলিক অধিকার আছে, এবং তা সংবিধানস্বীকৃত। একথা প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী মানুষদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—তা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মণ প্রমুখ আস্তিক্যবাদী ধর্মদর্শনে বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে যতখানি, বৌদ্ধ, জৈন প্রমুখ নাস্তিক্যবাদী ধর্মদর্শনের ক্ষেত্রেও ততখানি প্রযোজ্য। নানা উপজাতীয় জনগণের ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে যতখানি প্রযোজ্য, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নানা লোকধর্মের (folk religion) এবং অতীন্দ্রিয়বাদী মূঢ়, দুর্জ্ঞেয় ধর্মগোষ্ঠীর (mystic religious cult) ক্ষেত্রে ততখানি প্রযোজ্য এবং আউল-বাউল-সাঁই-দরবেশ-সুফী-কর্তা-ভজা-সাহেবধনী-বলাহারি ইত্যাদি হাজারো লোকায়ত গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও সত্য। ভারতবর্ষ সকলের। এই অধিকার শুধু স্বাধীন ভারতের সংবিধানসম্মত তাই নয়, ভারতবর্ষ আবহমানকাল ধরে কোনো এক জাতি ও এক ধর্মের—একথা বলাও ইতিহাসের প্রতি বেইমানি ও চরম অবিচার। তেমনি, যাঁরা আদৌ ধর্মবিশ্বাসী নয়, বা দৈনন্দিন বস্তুবাদী জীবনে যাঁরা কোনো অলৌকিক (supernatural) বা অতি-প্রাকৃত, আধিভৌতিক (metaphysical) বা দৈব (divine) ব্যাপারে বিশ্বাসী নয়, সংবিধান অনুসারে তাঁদেরও মৌলিক অধিকার ও নাগরিক ধর্ম পালনের পূর্ণ ক্ষমতা আছে। অযোধ্যা তথা ফৈজাবাদের সাধারণ মানুষ যে একথা বিশ্বাস করেন, তাঁরা যে সুস্থিতি, শান্তি এবং ভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাসী, তা রামজন্মভূমি বা বাবরি মসজিদপন্থীরা বিশ্বাস করবেন কিনা আমরা জানি না, কিন্তু সম্প্রতি সাধারণ নির্বাচনের ফৈজাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের ফলেই তা স্পষ্ট। ইতিহাস বলে, নানা যুগে নানা কালে ভিন্ন-ভিন্ন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী-ভাষার মানুষদের মধ্যে বৈচিত্র্য ও ঐক্য মিলেই এই 'মহামানবের সাগরতীর' গড়ে উঠেছে। এটাই ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

চতুর্থ এবং সবশেষে আমরা বলতে চাই যে, বর্তমান প্রবন্ধে কোনো রাজনৈতিক

দলের বা কর্মীর সমালোচনাও অন্বিষ্ট নয়। আমরা অ-রাজনৈতিক কোনো ধর্মীয় মৌলবাদী দলের কথাও এখানে আলোচনা করিনি। রাজনৈতিক বিতর্কের মঞ্চ আলাদা, তার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। এখানে শুধু ইতিহাস-বিচারই মুখ্য। যদিও স্বীকার্য যে, বহু দলই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়, তবু পাঠক-পাঠিকাগণ লক্ষ করবেন যে, একবারের জন্যেও রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ প্রশ্নে কংগ্রেস, ভারতীয় জনতা পার্টি, জনতা দল, সি.পি.আই., সি.পি.এম., বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, জামাত-ই ইসলামী, বজরঙ্গ দল, বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটি, হিন্দু মহাসভা, ইনসাফ পার্টি বা অন্য দল বা তার নেতৃত্ব, তাদের ভূমিকা নিয়ে কোনো কথা উচ্চারিত হয়নি। কারণ—তা নিষ্প্রয়োজন। কারা ঠিক, কারা ঠিক নয়, কারা কতখানি দায়ী, কতখানি সাম্প্রদায়িক, তার বিচার সাধারণ মানুষ করবেন। হয়তো ইতিহাসবিদও করবেন, কিন্তু সে ইতিহাস আপাতত আমাদের আলোচনার বাইরে। বিচার্য ও লক্ষণীয় শুধু এটাই যে, বলদর্পী পেশীশক্তি যেন ইতিহাসকে হত্যা না করে। 'ইদানীং তো হিন্দু মুসলমান সম্পর্ককে রামজন্মভূমির আর বাবরি মসজিদ প্রবক্তারা জেদাজেদি করে যেখানে নামিয়ে এনেছে তাতে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস আবার যেন তুঙ্গে উঠেছে'—একথা লিখে শ্রদ্ধেয়া গৌরী আইয়ুব মন্তব্য করেছেন একটু পরেই, 'কোনো মহৎ আদর্শেরই সত্যিকারের শক্তি পেশীতে নয়, পিস্তলে নয়—শক্তি থাকে তার উদার মানবিকতায়।' (দ্র. "চতুরঙ্গ, ৫০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা জুলাই, ১৯৮৯।) আমরা একমত। সেই সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে—ভবিষ্যতে পেশী-আস্ফালনের দাপটে যেন ইতিহাস কুঁকড়ে না যায় এবং বিকৃতি সত্যি বলে স্বীকৃতি না পায়। যদি তা হয় তাহলে তা হবে সত্যিই দুঃখের দিন। মানুষের মনে অসত্য বদ্ধমূল হয়ে গেলে বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাসে পরিণত হবে, সেটা হবে সেই মধ্যযুগীয় তামসিকতায় প্রত্যাবর্তন যখন মানুষ বিশ্বাস করত সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে না বললে পুড়িয়ে মারা উচিত। সহাবস্থান যেখানে সম্ভব, সদ্ভাব যেখানে কাম্য, সেখানে যে-কোনো দলেরই একগুঁয়েমি নিরবুদ্ধিতার পরিচায়ক নয় কি? ঘরে আগুন নিয়ে খেললে কী হয় তার উদাহরণও আমাদের ইতিহাসেই আছে।

রামজন্মভূমি আর বাবরি মসজিদ দুটোই অনৈতিহাসিক, অন্তত ঐতিহাসিক-প্রমাণ-সাপেক্ষ ঘটনা বা ব্যাপার নয়। তবু উভয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অনুযায়ী, দুটোই পাশাপাশি ছিল—সর্বদা শান্তিপূর্ণ না হলেও, কখনো-কখনো বিরোধ বা সংঘর্ষ হলেও, অধিকাংশ সময়ই সম্প্রীতিতে। ফৈজাবাদ জেলার অযোধ্যায় বাবরি মসজিদে উপাসনা করতেন মুসলমানরা, পাশে হিন্দুরা পূজার্চনা দিতেন চবুতরায় (একটি উঁচু বেদী বা মঞ্চ), যার মাপ ১৭ ফুট × ২১ ফুট। মাঝে মাঝে ছিল বেড়া, দূরত্ব ১০০ গজ। সেই সঙ্গে অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের অবস্থানের কথাও জানা যায়। ফৈজাবাদের লোকবিশ্বাস অনুযায়ী মুসলমান শাসকদের আমলেও হিন্দুরা তাঁদের ধর্মস্থানে পুজো দিতে পারতেন শাসকের ইচ্ছানুযায়ী। আকবর এই অনুমতি দেন, ঔরঙ্গজেব দেননি। অযোধ্যার নবাবি-আমলে আবার অনুমতি

দেওয়া হয়। নিকটবর্তী হনুমানগড়ি মন্দিরের পাণ্ডাদের পুরানো নথিপত্র থেকে দেখা যায় যে, নবাবদের বহু পদস্থ মুসলমান কর্মচারী হিন্দু পূজারীদের উপহার দিয়েছেন। ওয়াজেদ আলী শাহর সময় সম্প্রীতি থাকলেও ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকেরাই দুই সম্প্রদায়ের মনে বিদ্বেষের বীজ বপন করে। ১৮৫৫ এবং ১৯৩৪-৩৫ খ্রী. দুবার দাঙ্গা হলেও ভারত স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত আর কোনো বড়ো বিবাদের, হানাহানির কথা জানা যায় না।

সমস্যার সূত্রপাত হল ভারত স্বাধীন হওয়ার পর। সঠিকভাবে বলতে গেলে ২২ ডিসেম্বর, ১৯৪৯ খ্রী. যখন রামচন্দ্রের এবং সীতাদেবীর মূর্তি "অলৌকিকভাবে" নিজে-নিজেই জন্মস্থানে আর্বিভূত হলেন। সরকার এই স্থানকে 'বিতর্কিত' ঘোষণা করলেন; নানা মামলামোকদ্দমা শুরু হল। আসলে, উত্তর প্রদেশের তদানীন্তন সরকারি প্রতিবেদন ও কাগজপত্রেই দেখা যায়, ঘটনার প্রকৃত বিবরণ ও চরিত্র; সমস্যা তৈরি করা হল সাম্প্রদায়িক উগ্রতার কারণে। তা-ই বাড়তে-বাড়তে অধুনা রামজন্মভূমি 'অ্যাকশন কমিটি', বাবরি মসজিদ 'অ্যাকশন কমিটি'—পরস্পরের জেহাদ। গরিষ্ঠের হুংকার, লঘিষ্ঠের প্রতিবাদ কিভাবে কারা এই সমস্যা কেন সৃষ্টি করলেন—আমরা সে আলোচনায় যাব না। শুধু ধর্মবাদীরা ইতিহাসের যে অপব্যবহার করেছেন তাই প্রমাণ করার চেষ্টা করব। (সমস্যা-সৃষ্টির বিস্তারিত খবরের জন্য দ্র A. G. Noorani, *The Babri Masjid-Ram Janmabhumi Question, E.P.W, Nov,* 4-11, 1989)।

রামচন্দ্র, অযোধ্যা ও রাম-জন্মভূমি

রামজন্মভূমি প্রশ্নটি আলোচনা করার আগে দুটি প্রশ্ন আলোচনা ক'রে নিলে আলোচনার সুবিধে হবে। প্রথম হচ্ছে : রামচন্দ্র কে? ঐতিহাসিক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপক ড. সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য এর সহজ, সঠিক, সুন্দর অথচ সংক্ষিপ্ততম উত্তর দিয়েছেন : **'রাম রামায়ণ মহাকাব্যের নায়ক**। তিনি গোঁড়া হিন্দুদের বিবেচনায় পৃথিবীতে ঈশ্বরের অবতার এবং এখনো তাঁদের লক্ষ-লক্ষ ব্যক্তির দ্বারা পূজিত' (বঙ্গানুবাদ বর্তমন লেখকের। দ্র *A Dictionary of Indian History, 2nd revisd ed, Calcutta University, 1972, p. 767)*।

এইটি ঐতিহাসিকের কাছে গ্রহণীয় নিরপেক্ষ পরিচিতি। অর্থাৎ রামচন্দ্র—রামায়ণ অনুসারে অযোধ্যার রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। রাম মহাকবি বাল্মীকি-রচিত মহাকাব্যের নায়ক। এবং তিনি ভক্ত ও ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের বিশ্বাস অনুযায়ী ভগবানের অবতার, তাই পূজিত হয়ে আসছেন। কোথাও বলা হয়নি, যে রামচন্দ্র ঐতিহাসিক চরিত্র। আমরা এ কথা বলতে চাইছি না যে, রাম নামে কোনো ব্যক্তি বা চরিত্র কোনোকালে বাস্তবে ছিলেন না, তবে অদ্যাবধি কোনো ইতিহাসবিদ বলেননি রাম ঐতিহাসিক চরিত্র এবং তাঁর যুগ কোন্ সময়। যেহেতু ইতিহাসে তার কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না

থাকলে বা প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য না থাকলে শুধুমাত্র কাব্যে বর্ণিত স্থান ও চরিত্রের সত্যতা ইতিহাসবিদেরা স্বীকার করতে পারেন না। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাসকারদের নিকট জ্ঞাত—এর পূর্বে মহাকাব্যের যুগ, তার আগে বৈদিক যুগ, তারও আগে সিন্ধুসভ্যতার যুগ (খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের আগেকার যুগগুলি সম্বন্ধে কালানুক্রম-সহ অনেক ধারণাই আনুমানিক, এবং ফলত বহু মতভেদ আছে)। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ষোড়শ মহাজনপদের কাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারত-ইতিহাসের যেসব উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক চরিত্র ইতিহাসে স্মরণীয়, যেমন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, অশোক, কণিষ্ক, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, হর্ষবর্ধন, ইলতুতমিস, বলবন, আলাউদ্দিন, খলজী, মহম্মদ-বিন তুঘলক, বাবর, আকবর, শাহজাহান, ঔরঙ্গজেব, ক্লাইভ, কর্নওয়ালিস, ওয়েলসলি, ডালহৌসী, কার্জন থেকে গান্ধী, নেহরু, সুভাষ পর্যন্ত, রামচন্দ্রকে সেই গোত্রে আদৌ ফেলা যায় না।

এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটি। রামায়ণ-রচয়িতা কে ও রচনাকাল কখন? এর সহজ, সুন্দর এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে বিদুষী এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপিকা ড. সুকুমারী ভট্টাচার্য : 'রচনাকালের দিক থেকে দেখলে রামায়ণ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় দশকের মধ্যে রচিত; মহাভারত রচনা সম্ভবত শুরু হয় খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম বা চতুর্থ শতক থেকে এবং শেষ হয় খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতকে। অর্থাৎ বুদ্ধের পরের আট বা ন-শ বছরের মধ্যে এ দুটি মহাকাব্য রচিত হয়; এদের মধ্যে মহাভারত আগে শুরু হয়ে পরে শেষ হয়, রামায়ণ পরে শুরু হয়ে আগে শেষ হয়; আগে পূর্ণকলেবর মহাকাব্যের রূপ পায় বলেই সম্ভবত এর নাম আদিকাব্য। মনে রাখতে হবে, রামায়ণ শেষ হবার কাছাকাছি সময়ে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে : কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং মনুসংহিতা এই ক্রান্তিকালের রচনা এবং এর কিছু পরেই শুরু হয়ে যায় পুরাণগুলির রচনা। রামায়ণ ও মহাভারতে পরবর্তী সংযোজিত অংশগুলি অভিপৌরাণিক অর্থাৎ পুরাণে প্রতিফলিত যে সামাজিক মূল্যবোধ ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনের সমাবেশে ভারতীয় ধর্মচিন্তা, তার বিবর্তিত-রূপে ক্রমে 'হিন্দুধর্ম' বলে অভিহিত হল, এই অভি-পৌরাণিক অংশেই আমরা সেগুলির সাক্ষাৎ পাই। এদিকে রামায়ণের ও মহাভারতের মূল কাহিনী দুটি সম্ভবত অনেক প্রাচীনকাল থেকেই গাথায়, আখ্যানে জনমানসে সঞ্চরণ করছিল, ফলে মহাকাব্য দুটিতে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের দুটি চিত্র পাই : একটি মূল কাহিনীর আর একটি সংযোজিত বা প্রক্ষিপ্ত অভিপৌরাণিক অংশের।' (দ্র. প্রাচীন ভারত ঃ সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৪, পৃ. ১০০)।

রাম এবং রামায়ণ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, বহু পুরাতন কালে রামচন্দ্র নামে কোনো রাজা থাকতেও পারেন, নাও পারেন—রামের কাহিনী প্রচলিত ছিল, যার কোনো

অস্তিত্ব এখন অর নেই। গাথা, আখ্যান, জনশ্রুতি এবং কিংবদন্তীর কাহিনীই দীর্ঘ মহাকাব্যের আকারে পুনর্লিখিত হয় বাল্মীকির দ্বারা প্রথম বা আদিকাব্যে। এটি যেহেতু মহাকাব্য, এর বহুলাংশই তাই কল্পিত ঘটনা। অনেক সময়ই তো লোকবিশ্বাসের ধারণার সঙ্গে ইতিহাসের সাক্ষ্যপ্রমাণ পরস্পরবিরোধী হয় এবং ঐতিহাসিকের কাছে কল্পিত মহাকাব্যের কাহিনীর চাইতে পাথুরে প্রমাণ অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। (রামায়ণ সম্বন্ধে সাম্প্রতিক গবেষণার প্রমাণিক গ্রন্থের জন্য দ্রষ্টব্য J. L. Boockington, *Th Righteous Rama,* Oxford University Press, 1984)। লেখক দেখিয়েছেন কিভাবে একটি ক্ষত্রিয় বীরের কাহিনী ধীরে-ধীরে ধর্মগ্রন্থে পরিণত হল এবং ক্ষত্রিয়বীর কিভাবে এক অবতারে পরিণত হলেন পরবর্তী অভি-পৌরাণিক প্রক্ষেপগুলির দ্বারা।

বাল্মীকির রামায়ণ অনুযায়ী বা কিংবদন্তী ও মাইথোলজি অনুসারে, চারযুগ কল্পনা করা হয়, তর সঙ্গে ঐতিহাসিকদের যুগবিভাগের কোনো সম্পর্ক নেই। রামায়ণের মধ্যে তো শুধু বাল্মীকির রচনা নেই—কারণ কোনো ব্যক্তি তো চার-পাঁচশো বছর ধরে কোনো কব্যরচনা করতে পারেন না—স্বাভাবিক-ভাবেই বহু প্রক্ষিপ্ত অংশ তাতে আছে। সেই রামায়ণ অনুসারে অযোধ্যার রাজা রাম ত্রেতাযুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যা হচ্ছে কলিযুগের হাজার বছর আগে। কলিযুগের সূচনা নাকি হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০১২ অব্দে। এরকম কোনো যুগের কথাই ইতিহাসবিদরা জানেন না। বস্তুত, রাম চরিত্র যেমন কবির কল্পনা হিসেবে অনেকাংশেই কল্পিত সাহিত্যিক চরিত্র, বাল্মীকির রামায়ণের অযোধ্যাও অনেকটাই মনোগড়া কল্পনা-মাত্র, ইতিহাসের সঙ্গে তার অনেক ফারাক।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আলোচ্য মূল প্রশ্নগুলি হল রামায়ণের অযোধ্যা আর আজকের অযোধ্যা কি এক? অযোধ্যাই কি রামের জন্মভূমি? যদি হয়, তাহলেও কি নির্দিষ্ট কোনো স্থান বলা সম্ভব? এ ব্যাপারে ইতিহাসের কী সাক্ষ্য? ঐতিহাসিকরাইবা কী বলেন? রামজন্মভূমি যদি নির্দিষ্ট করা না যায়, তাহলে রামজন্ম-মন্দিরও কি কল্পনা নয়? আমরা এবার এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।

(১) রামচন্দ্র (সূর্যবংশীয় এই নৃপতি জনমানসে প্রচলিত গাথা-আখ্যান ও বিশ্বাস অনুযায়ী এবং রামায়ণ অনুসারে অযোধ্যায় দশরথের পুত্র হিসেবে যদি বাস্তবে রাজত্ব করেও থাকেন) ঠিক কোন্ যুগের মানুষ, ত বলা মুশকিল। কিংবদন্তী অনুসারে, ত্রেতাযুগে, কারো মতে খ্রীষ্টপূর্ব ১৪-১৫ শতকের। প্রাচীন ইতিহাসের কোনো প্রমাণই নির্দিষ্টভাবে এ-ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করে না। প্রয়াত প্রত্নতত্ত্ববিদ অধ্যাপক সাংকালিয়াকে (H. D. Sankalia) প্রশ্ন করা হয়েছিল : 'আপনি কি সুনির্দিষ্টভাবে অযোধ্যার ঠিক কোন্ জায়গায় রাম জন্মেছিলেন বলতে পারেন?' তিনি জবাব দেন, 'না। আমি মনে করি এটা বলা সম্ভব নয়' (অনূদিত। দ্র. *Sunday,* March 27, 1988)। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ ও ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি সাংকালিয়ার মতোই, অপর প্রাচীন

ইতিহাসবিশেষজ্ঞ ও ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের (নতুন দিল্লী) প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের প্রাক্তন ও ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ড. রামশরণ শর্মার মতে, 'যদি বর্তমান অযোধ্যাকে রামচন্দ্রের রাজধানী বলে ধরে নেওয়া হয়, তিনি সত্যিই সেখানে বসবাস করতেন কিনা তা গভীর সন্দেহের বিষয়' (অনূদিত। দ্র. *The Times of India,* April 12, 1987)।

(২) নতুন দিল্লীর 'টাইমস অব ইনডিয়া' পত্রিকায় 'আওরঙ্গজেবের পর কৃষ্ণের জন্মস্থান' শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হলে এক প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করেন। (ওই পত্রের প্রকাশ-তারিখ দিল্লী সংস্করণে অক্টোবর ২১, ১৯৮৬ বোম্বাই সংস্করণে অক্টোবর ২৮, ১৯৮৬ নতুন দিল্লীর জওয়াহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ যাঁদের মধ্যে আছেন রোমিলা থাপার, সর্বপল্লী গোপাল, বিপানচন্দ্র, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, মুজফফর আলম, হরবনস মুখিয়া, মাধবন পালাত, সতীশ সবেরওয়াল, আর চম্পকলক্ষ্মী প্রমুখ। তাঁদের বক্তব্যের তিনটি পংক্তি উদ্ধার যোগ্য :

It creates the kind of confusion such as has been created, probably deliberately, over the question of the birthplace of Rama in the matter of Rama Janmabhoomi. It would be worth enquiring whether there is reliable historical evidence of a period prior to the nineteenth century for this association of a precise location for the birthplace of Rama/...It is a debasement of history to distort these events for present day communal propaganda.

এই জওয়াহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের বর্তমান প্রধান ড. কে. এন. পানিক্করের উদ্যোগে বিতর্কিত রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ স্থানটি ধর্মস্থান হিসেবে কোনো সম্প্রদায়ের হাতে না দিয়ে জাতীয় সৌধ হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণের এক প্রস্তাব গ্রহণ করে যা ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়, এবং তা ছাড়া ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনটার ফর হিস্টরিক্যাল স্টাডিজের পক্ষ থেকে এক প্রচারপুস্তিকা প্রকাশ করা হয় ইংরেজিতে যাতে বিভাগের সাতাশ জন ইতিহাসবিদ স্বাক্ষর করেন (পুস্তিকাটির এক বঙ্গানুবাদের জন্য ড. গৌতম চট্টোপাধ্যায়, "রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইতিহাস-বিকৃতি", কালান্তর, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৮৯)।

(৩) অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, সুপ্রাচীন যুগে যে অঞ্চলে বর্তমানের অযোধ্যা সেখানে আদৌ জনগণের বসতি ছিল না; অন্তত পুরাতত্ত্বে তেমন সাক্ষ্য নেই। অযোধ্যার প্রাচীনতম জনবসতির সাক্ষ্য পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে, কিন্তু সেখানেও বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত অযোধ্যার চেয়ে ঢের বেশি আদিম জীবনযাত্রার প্রমাণ পাওয়া যায়।

(৪) পূর্বোক্ত খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকের পুরাতত্ত্বে সাক্ষ্য থেকে মনে হয় না যে অযোধ্যা অঞ্চলে কোনো শহর ছিল, জীবনযাত্রা ছিল গ্রামীণ। অথচ রামায়ণের বর্ণনা অনুসারে অযোধ্যা শহরে অট্টালিকা ও প্রাসাদের বর্ণনা আছে।

(৫) অযোধ্যা ঠিক কোথায় ছিল, তাও বলা মুশকিল। ভিনসেনট স্মিথ, আলেকজান্ডার কানিংহাম, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত গবেষণায় যতদূর জানা গেছে এবং বর্তমানে স্বীকৃত, তাতে প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের পূর্বের কাল পর্যন্ত ভারতের ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। খ্রী.পূ. ষষ্ঠ শতকেই 'ষোড়শ মহাজনপদ' উত্তর ভারতে গড়ে ওঠে যার অন্যতম ছিল কোশল (বাকিগুলি কাশী, অঙ্গ, মগধ, কুরু, চেদী, মৎস, গান্ধার ইত্যাদি)। এই কোশল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল অযোধ্যা। অঙ্গুত্তরনিকায়, ভগবতীসূত্র ইত্যাদি বৌদ্ধ-জৈন গ্রন্থগুলিতে ছয়টি প্রধান নগরের নাম পাওয়া যায়—চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী আর বারাণসী। তাতে অযোধ্যার নাম নেই। অন্যান্য নগরের মধ্যে যেমন বৈশালী, তক্ষশিলা, মথুরা, অহিচ্ছত্র, কুশীনারা, ইন্দ্রপ্রস্থ, উজ্জয়িনী পাই, অযোধ্যা নেই। কোশলরাজ্যের মধ্যে দুটি শহর শ্রাবস্তী আর সাকেত, প্রথমটি রাজধানী। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, সাকেত-ই পরবর্তী কালের অযোধ্যা, যদিও রিস ডেভিডস উল্লেখ করেছেন যে গৌতম বুদ্ধের সময় দুটি স্বতন্ত্র শহরের অস্তিত্ব ছিল। কোনো-কোনো পরবর্তী পুরাণে এক অযোধ্যার উল্লেখ আছে, তা গঙ্গাতীরে—সরযূতীরে নয়। মনে হয় এই অনুমানই যুক্তিসঙ্গত যে সরযূনদীর তীরস্থ প্রাচীন সাকেত শহরই অযোধ্যায় নামান্তরিত।

(৬) পঞ্চম শতাব্দীতে এই নামান্তর হয়েছিল। উত্তর ভারতে গুপ্তশাসনের তখন শেষ যুগ। সিংহাসনে স্কন্দগুপ্ত (খ্রী ৪৫৫-৬৭)। তিনি সাকেতকে তার অন্যতম ঘাঁটি করেন। মগধের উত্থানের পর ভারতের ইতিহাসে মৌর্য, কুষাণ, গুপ্ত যুগ পার হয়ে তখন অনেক জল বয়ে গেছে। স্বাধীন কোশল আর নেই। স্কন্দগুপ্ত হুনদের এক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করার পর 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর স্বর্ণমুদ্রায় তা ব্যবহৃত। এইভাবে মহাকাব্যের অযোধ্যা সাকেতের সঙ্গে মিশে গিয়ে থাকতেও পারে। স্কন্দগুপ্ত রামভক্ত কিনা জানা যায় না, তবে সম্ভবত তিনি জনমানসে প্রচলিত সূর্যবংশীয় বা ইক্ষ্বাকুবংশীয় রামের ঐতিহ্যকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন।

(৭) স্থানীয় লোকগাথা অনুসারে, ত্রেতাযুগের পর অযোধ্যা অবলুপ্ত হয় এবং বিক্রমাদিত্য তাকে পুনরাবিষ্কার করেন। এ নিয়ে একাধিক ধর্মীয় রূপকথা আছে, যার মাধ্যমে পঞ্চম শতাব্দী থেকে শহরকে ঘিরে এক ধর্মীয় বাতাবরণ সৃষ্টির চেষ্টা হয় যা তার আগে ছিল না। তবে বিক্রমাদিত্য রামের জন্মস্থান আবিষ্কার করার পর কোনো মন্দির স্থাপন করেন, এমন সাক্ষ্যপ্রমাণ ইতিহাসে নেই।

(৮) সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে অনেক বইপত্রে, পুরাণে, লোককাহিনীতে অযোধ্যার কথা স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে। এমনকী আরো উত্তরকালে বিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণ রামায়ণ অনুসারে অযোধ্যাকেই বলছেন কোশলের প্রাচীন রাজধানী, শ্রাবস্তী নয়। অর্থাৎ জনগণের বিশ্বাস অনুযায়ী ইতিহাস বদলে যাচ্ছে।

(৯) খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে সাকেত, প্রাচীন কোশলের অন্যতম বড়ো শহর, রামায়ণের অযোধ্যার সঙ্গে একাত্ম করা হলেও, সেই শহরের ঠিক কোথায় রাম জন্মেছিলেন তা বলা সম্ভব হয়নি। তুলনায় বুদ্ধের জন্মস্থান অনেক সুনিশ্চিত। হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তুও একদা কোশলরাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল। যাইহোক, বুদ্ধের মৃত্যুর অনেক পরে মৌর্য সম্রাট অশোক বৌদ্ধ জন্মস্থানকে স্মরণীয় করার জন্য লুম্বিনী গ্রামে (বর্তমানে নেপালে) একটি শিলালেখ স্থাপন করেন, কিন্তু সেখানেও জমি বা জায়গা নির্দেশ করা যায়নি। তাছাড়া খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর থেকে অযোধ্যা রামপূজার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠেনি। (আরো দ্রষ্টব্য Gyanendra Pandey, "Ayodhya Myth", The Sunday *Statesman.* Miscellany, Dec 3, 1989)।

(১০) পঞ্চম থেকে অষ্টম শতাব্দীর বহু লেখাতেই অযোধ্যার উল্লেখ আছে, কিন্তু কোনো শিলালিপিতেই বলা নেই যে ওই শহর রামপূজার প্রধান কেন্দ্র বা রামজন্মভূমি কোন্ জায়গায়।

(১১) সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ইউ এন সাঙ লিখে গেছেন যে অযোধ্যা বৌদ্ধ ধর্মেরও একটা বড় কেন্দ্র। সেখানে আছে বহু বৌদ্ধ মঠ আর স্তূপ এবং বহু বুদ্ধভক্ত মনে করেন যে অযোধ্যা তাদের কাছে পবিত্র যেহেতু তথাগত ওখানেও কিছুদিন অতিবাহিত করেছেন।

(১২) অযোধ্যা অঞ্চলে খননকার্যের ফলে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় শতকের পোড়ামাটির জৈনমূর্তি পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন—একদা এখানে জৈন তীর্থও ছিল। জৈন ভক্তরাও মনে করেন যে, তাঁদের প্রথম ও চতুর্থ তীর্থঙ্কর অযোধ্যার বাসিন্দা ছিলেন।

(১৩) একাদশ শতাব্দীর একটি লেখাতে অযোধ্যাকে গোপতরুতীর্থ বলা হয়েছে, কিন্তু সেখানেও রামজন্মভূমির কোনো উল্লেখ নেই। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে মুসলমান সুলতানি শাসকদের আমলে অযোধ্যা অঞ্চলে রামপূজার তেমন প্রচলন ছিল না। হিন্দুদের মধ্যে শৈবরাই ছিলেন প্রধান, তাঁদের মন্দিরমঠও ছিল। প্রচলিত লোকবিশ্বাস ও জনমত অনুযায়ী, মুঘল যুগে মসজিদ নির্মিত হওয়ার পরও তার পাশেই একস্থানে হিন্দুরাও অর্চনা দিতেন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দি-ভাষায় রামকাহিনী জনপ্রিয় ভঙ্গিমায় সন্ত তুলসীদাস কর্তৃক লিখিত হওয়ার পরই অন্যান্য হিন্দি বলয়ের মতো অযোধ্যাতেও রাম-কথা বিশেষ জনপ্রিয় হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে হিন্দু মঠ মন্দির রামের নামে নির্মিত হতে থাকে। রামজন্মভূমি ও মন্দিরের পরিবর্তে তা ধ্বংস করে মসজিদ—এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হতে শুরু করে। অথচ ইতিহাস এ বিষয়ে কোনো সাক্ষ্য দেয় না।

(১৪) সম্প্রতি ভারত সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ (Archaelogical Survey of India) ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন অধিকর্তা বি. বি. লালের অধীনে যে বিস্তৃত অনুসন্ধান

ও খননকার্য চালান, তাতে দেখা যায় যে, বর্তমান অযোধ্যা যে রামের জন্মভূমি ছিল বা এটাই যে প্রাচীন অযোধ্যা বা মসজিদের স্থানে বা আশেপাশে জন্মস্থানের স্মরণে কোনো মন্দির নির্মিত হয়েছিল—এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আশির দশকে কয়েকজন গবেষক ব্যক্তিগত উদ্যোগে সন্ধান চালিয়ে দেখেন রামজন্মস্থান বলে সাতটি জায়গা বিভিন্ন ব্যক্তি দেখাচ্ছেন। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। (দ্র. *Journal Indian Archaelogy,* 1976-77, Report of the Investigatior, by correspondents, Nilanjan Mukhopadhyay *Sunday Mail,* Nov. 20, 1988 & by Pankaj Pachauri, *India Today,* Jan 15, 1989; Surinder Kaur, "Is Babri Masjid Site the Birthplace of Rama ?" *Radiance,* Aug 13, 1989)।

বাবর এবং বাবরি মসজিদ

মুঘল বাদশাহ বাবর কি বাবরি মসজিদ তৈরি করেছিলেন? প্রশ্নটিই অদ্ভুত মনে হয়। কারণ বাবর যদি না তৈরি করেন তাহলে মসজিদের নামটি বাবরি মসজিদ হল কী করে? অথচ মজার ব্যাপার তাই। যদিও মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, মসজিদটি বাবরের 'নির্দেশে' তৈরি করা হয়েছিল, তবুও কিন্তু এ ব্যাপারে যথেষ্ট সংশয় আছে। বস্তুতপক্ষে বাবরি মসজিদ যে বাবর তৈরি করেছিলেন কিংবা তাঁর নির্দেশে তাঁর অনুগত অন্য কোনো ব্যক্তি নির্মাণ করেছিলেন, সমসাময়িক দলিলে তার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য নেই। যেমন এখনও পর্যন্ত কেউ কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করেননি যে, বাবরি মসজিদ যে ভূখণ্ডে নির্মিত, সেই জায়গায় আগে একটি মন্দির ছিল।

যাঁরা বাবরি মসজিদের ক্ষেত্রে মসজিদ রক্ষার জন্য পূর্ণ আনুগত্য এবং নিরঙ্কুশ সমর্থন জানিয়েছেন, তাঁরা ধরেই নিয়েছেন যে মসজিদটি বাবরের তৈরি। সুতরাং এখানে তাঁদের বিশ্বাসই বড়ো, ঐতিহাসিক সত্য নয়। আবার এর সঙ্গে যেহেতু তাঁদের ধর্মীয় চেতনা আর বিশ্বাস যুক্ত, তাই যুক্তির চেয়ে বড়ো হচ্ছে আবেগ। ঠিক তেমনি, যাঁরা রামজন্মভূমির ক্ষেত্রে মন্দির নির্মাণের জন্য পূর্ণ উদ্যম ও সক্রিয় সহযোগিতা জানিয়েছেন, তাঁরা ধরেই নিয়েছেন যে বাবর যেহেতু গোঁড়া মুসলমান, তাই অ-হিন্দু ইসলামধর্মাবলম্বী সম্রাটের পক্ষে মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ স্বাভাবিক। এখানেও, তাঁদের বিশ্বাসই বড়ো, ঐতিহাসিক সত্য নয়। এখানেও তাঁদের বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত ধর্মীয় আবেগ। তাই যুক্তির চেয়ে আবেগই হয়েছে বড়ো।

অথচ ইতিহাসে আবেগের স্থান নেই, সেখানে প্রাধান্য তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে গঠিত সত্যনিষ্ঠ সিদ্ধান্তের।

তবে 'বাবরি মসজিদ' কথাটির উৎপত্তি কিভাবে? যাঁরা এই নামটি জোর দিয়ে বলেন তাঁদের দাবির পিছনে রয়েছে মসজিদের গায়ে খোদিত লেখা। কী আছে এই লেখায়

সেকথা একটু পরেই আসব। স্বীকার করতেই হবে—মসজিদ একটি হয়েছিল, কারণ মসজিদটি এখনও বিদ্যমান। আর যাঁরা বিশ্বাস করেন এই মসজিদ বাবরের কীর্তি, তাঁদের মতে ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাবর বিহারের পাঠান-শক্তির বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালানোর সময় অযোধ্যায় শিবির স্থাপন করেছিলেন। সেই সময় তাঁর নির্দেশে আমীর মীর বাকি (Mir Baqi) একটি মসজিদ নির্মাণ শুরু করেন, যা ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়।

দুর্ভাগ্যবশত, বাবর অযোধ্যায় কখনো গিয়েছিলেন কিনা কিংবা বিহারের পাঠান-শক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়ার সময় ফৈজাবাদ দিয়েই গিয়েছিলেন কিনা, আজ সন্দেহাতীতভাবে তা বলা সম্ভব নয়। আমরা কোনো সমসাময়িক সূত্র থেকে এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই না। আমরা যদি এইখানে ভারতবর্ষে বাবরের কর্মকাণ্ড এবং তাঁর বিষয়ে প্রাথমিক সূত্রগুলি সেই সূত্রে আলোচনা করি, তাহলে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বাবরের সম্পর্কে জানার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, প্রামাণিক এবং প্রাথমিক সূত্র বাবরের আত্মজীবনী, যা তুর্কি ভাষায় তিনি রচনা করেছিলেন। নাম "তুজুক-ই-বাবুরি"। তুর্কি পাঠ প্রকাশ করেন ইলমিনস্কি (Ilminski) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। এবং আর একটি প্রকাশ করেন অ্যানেট সুসান বেভারিজ (A. S. Beveridge) ১৯০৫ খ্রী। এই শেষোক্ত সংস্করণ সম্ভবত হায়দরাবাদে রক্ষিত কপির ফ্যাকসিমিলি। (দ্র. জার্নাল অব দ্য রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯০৬, পৃ. ৮৭)। এই তুর্কি আত্মজীবনীটি পরবর্তী কালে ফরাসি ভাষায় ভাষান্তরিত হয়। এগুলির মধ্যে দুটি প্রধান। একটি করেন পায়নাদা হাসান, অপরটি মির্জা আবদুর রহিম। এই আত্মজীবনী একাধিক ইয়োরোপীয় ভাষায় অনূদিত এবং প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি। প্রথমটি আরস্কাইন ও লিডেন (Erskine and Leyden) ১৮২৬ খ্রী মুদ্রিত (কিংস এডিশন, লনডন, দু খণ্ড), যা পূর্বোক্ত দ্বিতীয় ফারসি পাঠের ইংরিজি অনুবাদ। দ্বিতীয়টির অনুবাদক Pavet De Courteille, ১৮৭১ খ্রী মুদ্রিত ইলমিনস্কির পূর্বোক্ত তুর্কি পাঠের অনুবাদ। দুটি অনুবাদই ত্রুটিপূর্ণ। তৃতীয় অনুবাদটি সর্বাপেক্ষা নির্ভরশীল এবং বহুল ব্যবহৃত ইংরিজি অনুবাদ। এটিও হায়দরাবাদ পাঠের ভাষান্তর। "বাবরনামা" শীর্ষক এই অনুবাদটির রচয়িতা অ্যানেট বেভারিজ। ১৯২১-২২ খ্রী. লনডন থেকে প্রকাশিত। সম্প্রতি নতুন দিল্লী থেকে "বাবরনামা"র দু-খণ্ডের এক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭২-এ। প্রতিটি অনুবাদের ক্ষেত্রেই মূলানুগত্যের প্রশ্ন তো আছেই, কেননা অনুবাদকগণ সর্বদা সঠিক শব্দার্থ ব্যবহার করেননি। এর চেয়ে বড়ো প্রশ্ন হল বাবর তাঁর নিজের জীবনের সব ঘটনা আনুপূর্বিক আত্মকথায় লেখেননি। বিশেষত ১৫০৩-০৪ খ্রী, ১৫০৮-১৯ খ্রী এবং ১৫২০ খ্রী ফাঁক থেকে গেছে। এই ফাঁকগুলি পূরণের জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয় সমসাময়িক অন্য সূত্রগুলির উপরে।

এই অন্য সূত্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কেতাবগুলি হল বাবরের সম্পর্কিত ভাই মির্জা হায়দর দুঘলাট (১৪৯৯-১৫৫১) রচিত 'তারিখ-ই-রশিদি' (১৫৫১)। এটির

ইংরাজি অনুবাদ করেছেন N Elias এবং Denison Ross একত্রে; লনডন, ১৮৯৮। খোয়ান্দ আমির (১৪৭৪-১৫৩৪) রচিত 'হাবিব উস্ সিয়াব' (১৫২১-২৯) ইয়োরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়নি। তাছাড়া আছে জৈনুদ্দিনের 'ওয়াকিয়াত-ই-বাবুরি'। জৈনুদ্দিন ছিলেন বাবরের কর্মচারী। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য বাবরের কন্যা গুলবদন বেগমের (১৫২৩-১৬০৩) "হুমায়ুননামা" (১৫৮৭) যদিও স্থানে-স্থানে পক্ষপাতপূর্ণ। শ্রীমতী অ্যানেট বেভারিজ এই কেতাবটির (ফারসি ভাষায় রচিত) একটি সম্পাদিত ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন (রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি, লনডন, ১৯০২)। এ ছাড়া, বাবরের জীবনীকার রাসব্রুক উইলিয়ামস ব্যবহার করেছিলেন আরো তিনটি সমসাময়িক পুস্তক—মিরজা মহম্মদ সালিহ্-রচিত "শাইবনিনামা" (সম্ভবত A. Vembery-কৃত অনুবাদ); মিরজা সিকান্দার মুনশি-রচিত "আলিম আরাই আব্বাসি"; মিরজা বরখোয়ারদার-রচিত "আসান উস্ সিয়ার"। এইসব কেতাবগুলি ছাড়াও বাবর সম্পর্কে জানার জন্য আরো পাঁচ-ছটি গৌণ সূত্র আছে। যেমন, আবদুল হক দেহল ভি-রচিত "তারিখ ই হককি" এবং হাসান-রচিত "আসান উত্ তাওয়ারিখ"। দুটি কেতাবের অবিকল পাণ্ডুলিপি অকসফোর্ডের বোদলিয়ার লাইব্রেরিতে আছে। মোল্লা মুহম্মদ কাশিম (১৫৭০-১৬২৩), যিনি ফেরিস্তা নামেই অধিক পরিচিত, তাঁর "গুলশন-ই-ইব্রাহিমি" বা "নৌরসনামা" যা "তারিখ-ই-ফেরিস্তা" (১৬১৯-২০) নামে সুপরিচিত। এতে বাবর সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে (জে. ব্রিগস্-এর ইংরিজি অনুবাদও পাওয়া যায়)। উপরোক্ত প্রাথমিক এবং গৌণ সূত্রগুলি ছাড়াও প্রায়-সমসাময়িক বাবরের পৌত্র আকবরের সময়কালীন দুজন লেখকের রচনাও কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজন। এই দুই লেখক হলেন (মিরজা অথবা খাজা) নিজামুদ্দিন এবং আবুল ফজল। নিজামুদ্দিন আহমেদ-রচিত "তবাকাৎ-ই-আকবরী" ১৫৯২-৯৪ বা 'তবাকাৎ-ই' আকবরশাহী" (ব্রজেন্দ্রনাথ দে, এম. হিদায়েত হুসেন, বেণীপ্রসাদ প্রভৃতি পণ্ডিতজনের সাহায্যে এর অনেকাংশ অনূদিত) এবং শেখ আবুল ফজলের (১৫৫০-১৬০২) "আকবর-নামা"। (এর বহু অনুবাদ আছে, মুদ্রিত সংস্করণ আছে। ফারসি মুদ্রণ, তিন খণ্ড বিবলিওথেকা ইনডিকা, কলকাতা, ১৮৭৩-৮৭; ইংরিজি সং অনু. হেনরি বেভারিজ, তিন খণ্ড, ১৮৯৭-১৯২১)।

বাবর সম্পর্কে সমসাময়িক তথ্য-প্রাপ্তির জন্য প্রাথমিক উপাদানগুলির সবিস্তার উল্লেখ করা হল এই জন্য যে, কোথাও বাবরের অযোধ্যা অভিযান, কিংবা বিহারের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় অযোধ্যায় অবস্থান এবং তার সময়-তারিখ এবং সেই অবস্থানকালীন সময়ে তথাকথিত রামজন্মভূমির স্থানে, মন্দির ভেঙে অথবা না ভেঙে মসজিদ গড়ার কোনো উল্লেখ নেই। এই কাকতালীয় ব্যাপার যুক্ত হয় উনিশ শতক থেকে ইংরেজ লেখকদের দ্বারা। আমরা সে প্রসঙ্গে পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

আমরা সাবই জানি যে, বাবর ১৫২৬ খ্রী পানিপথের প্রথম যুদ্ধে লোদীবংশীয় সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

বা পত্তন করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেও তিনি এই নব-গঠিত মুঘল শক্তিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা কিংবা সাম্রাজ্যকে বিস্তারিত করা কিংবা সাম্রাজ্য গঠনের পর ভোগ করা—এসব কিছুই করতে পারেননি। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর মাত্র ৪৮ বছর বয়সে আগ্রাস্থিত মনোরম উদ্যানগৃহে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস নির্গত হয়। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রথম বাবর সম্পর্কে সবিস্তার না হলেও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন William Erskine তাঁর *A History of Indian at the Time of Babur and Humayum* শীর্ষক গ্রন্থে (লনডন, ১৮৫৪)। এর পর ইংরাজি ভাষায় দুটি সুলিখিত জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়, যা অদ্যাবধি ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বাবর সম্পর্কে জানার জন্য অপরিহার্য। এই দুটি হল স্কটল্যানডের ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজের আরবি ভাষার অধ্যাপক স্ট্যানলি লেন-পুল (Stanley Lane-Poole) লিখিত *Babur* (মূল সং, 1899, শেষ ভারতীয় সং, S. Chand & Co, New Delhi, 1971), যা Rulers of India সিরিজের স্যর উইলিয়ম উইলসন হানটারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় এবং অপরটি হল একদা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক রাসব্রুক উইলিয়মস (L. F. Rushbrook Williams) লিখিত *An Empire Builder of the Sixteenth Century* (Allahabad University Lectures, 1915-16, পরবর্তী সং S. Chand & Co, নতুন দিল্লী, তারিখ নেই।)

সমসাময়িক তুর্কি বা ফারসি কেতাবগুলি বা পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকদের গবেষণাধর্মী রচনাবলীগুলি থেকে পানিপথের প্রথম যুদ্ধের (২০ এপ্রিল, ১৫২৮) থেকে বাবরের মৃত্যু (২৬ ডিসেমবর ১৫৩০) পর্যন্ত ইতিহাস যতদূর আমরা জানতে পারি, তাতে স্পষ্ট ভাষায় এমন কোনো প্রামাণিক তথ্য নেই যে, বাবর অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ তৈরি করেছিলেন। এইখানেই সমস্যা। তবে মসজিদটি যদি বাবরের আমলে হয়েও থাকে, এবং তার থেকেই যদি রাবরের আমলে হয়েও থাকে, এবং তার থেকেই যদি বাবরি মসজিদ কথাটি প্রথমে স্থানীয় জনগণের মধ্যে, এবং পরে সর্বত্র চালু হয়ে থাকে, তাহলেও সেই মসজিদের স্থানে পূর্বে একটি মন্দির ছিল, এমন কোনো কথা কোথাও বলা নেই। "তুজুক ই বাবুরি" বা "ওয়াকিয়াত-ই বাবরি" বা "বাবরনামা"র কোনো সংস্করণে বা কোনো ভাষ্যে ১৫২৬ থেকে ১৫৩০-এর মধ্যে তৎকালীন অযোধ্যার কোনো মন্দির বাবর ভেঙেছিলেন বলে উল্লেখ নেই। বাবর পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করার পরে অচিরেই দিল্লী এবং আগ্রা তাঁর হস্তগত হয়। খানুয়ার যুদ্ধে (১৭ মার্চ, ১৫২৭) রাজপুতনার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রানা সঙ্গ বা সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করার ফলে উত্তর ভারতে বাবরের ক্ষমতা আরো নিরঙ্কুশ হয়। রাসব্রুক উইলিয়ামস লিখেছেন 'এর আগে অবধি হিন্দুস্থান দখল বাবরের অ্যাডভেনচারময় জীবনের একটি ঘটনামাত্র হিসাবে যদিও দেখা যেতে পারে, তবু এই যুদ্ধে জয়লাভের পর থেকে এটাই হয় তাঁর বাকি জীবনের কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ,

পৃ. ১৫৬, অনুবাদ বর্তমান লেখকের)। শুধু মেবারের রানাই নয়, ধীরে-ধীরে অন্যান্য রাজপুত রাজ্যও তাঁর দখলে আসে। (১৫২৮ খ্রী জানুয়ারির মধ্যে)। এরপর বাবরের দৃষ্টি সঙ্গত রাজনৈতিক এবং সামরিক কারণেই নিবদ্ধ হয় পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাওয়া সেইসব পাঠান নেতাদের প্রতি, বিশেষত ইব্রাহিম লোদীর ছোটো ভাই মাহমুদ লোদীর দিকে। ইনি বিহারে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং বাঙলার সুলতান নসরত শাহের সমর্থন পেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত গঙ্গা এবং ঘাঘরা নদীর সঙ্গমস্থলের নিকটবর্তী ঘাঘরার যুদ্ধে বাবর পাঠান শক্তিকে সম্পূর্ণ নির্মূল করেন, বাঙলার সঙ্গে সন্ধি করেন এবং স্ট্যানলি লেন-পুলের সঙ্গে আমরা একমত যে 'তিনটি যুদ্ধের মাধ্যমে বাবর উত্তর ভারতকে সম্পূর্ণ পদানত করেন' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৯২, বাঙলা তরজমা বর্তমান লেখক)।

আগ্রা থেকে ঘাঘরা যাওয়ার পথে মুঘল সৈন্যবাহিনী একাধিক পথে গিয়েছিল। এলাহাবাদ, চুনার, বেনারস এবং গাজীপুর হয়ে, জৌনপুর হয়ে। বাবর অযোধ্যা দিয়ে গিয়ে থাকতেও পারেন। তবে কোনো প্রমাণ নেই। তিনি নিজে না গেলেও তাঁর সৈন্যদল যেতে পারে আর পরবর্তী কালে ইংরেজ লেখকগণ যে জোর দিয়ে বলেছিলেন বাবর আউধ-এ ছিলেন, সেই আউধ আর প্রাচীন অযোধ্যাও এক আদৌ নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী লেখক-লেখিকাদের ভূমিকা আমরা পরবর্তী অংশে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। এখানে শুধু উল্লেখ করতে হবে যে, লিডেন তাঁর "বাবরনামা"র অনুবাদে টীকায় উল্লেখ করেন ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৮ তারিখে অযোধ্যায় ছিলেন। শ্রীমতী অ্যানেট সুসান বেভারিজ তাঁর অনুবাদ গ্রন্থে লেখেন যে সম্ভবত বাবর অযোধ্যার ৭২ মাইল উত্তরে শিবির স্থাপন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, আরো এক ধাপ এগিয়ে তিনি লেখেন—বাবরের নির্দেশেই ওই মসজিদ নির্মিত হয়। প্রমাণ হিসেবে তাঁর সাক্ষ্য মসজিদের গায়ে খোদিত ফারসি লিপি। "বাবরনামা" গ্রন্থের মূলপাঠের মধ্যে যদিও কিছু নেই। অ্যানেট বেভারিজ তাঁর অনুবাদের বইতে স্মৃতিচারণের সঙ্গে ঐ লিপির অনুবাদও যুক্ত করেন। তার উল্লেখযোগ্য অংশটি এরকম :

> 'যাঁর বিচারের খ্যাতি ও ধারা এমন এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করেছে যা স্বর্গের সু-উচ্চ চূড়া পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, সেই বাদশাহ বাবরের নির্দেশক্রমে মহৎহৃদয় মীর বাকি এখানে দেবদূতগণের অবতরণের আলোকিত ভূমি নির্মাণ করলেন।'

শুধু তাই নয়, অনূদিত অনুচ্ছেদটির পাদটীকায় শ্রীমতী বেভারিজ লেখেন যে, তিনি ওই কাহিনী বিশ্বাস করেন। তাঁর যুক্তি একটু বেশি সরল। তাঁর মতে, 'সম্ভবত মসজিদটি বাবরের নির্দেশে নির্মিত' (*Presumable* the order for building the mosque) যখন

বাবর আউধে ছিলেন, এবং বাবর যেহেতু মুসলমান, তাই 'হিন্দু মন্দিরের পবিত্রতা ও খ্যাতির গুরুত্ব বুঝে তিনি পূর্বেকার মন্দিরটি অংশত ভেঙে' মসজিদ নির্মাণ করান মীর বাকিকে দিয়ে। বেভারিজের যুক্তি—হজরত মহম্মদের অনুগামী বাবর অন্য ধর্ম সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অসহিষ্ণু ছিলেন, এবং তাই হয়তো মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক।

শ্রমতী অ্যানেট সুসান বেভারিজের সিদ্ধান্ত কিন্তু ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর ভিত্তি করে নয়। তিনি তেমন প্রমাণ দেবার প্রয়োজনও বোধ করেননি। বাবরের ধর্মীয় মতামত ও আচরণ এবং ভারতে তাঁর রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ থেকে আমাদের পক্ষে বেভারিজের সিদ্ধান্ত মানা কঠিন। বরং "বাবরনামা" পাঠ করলে বা বাবরের শেষ উইল থেকে আমাদের বিপরীত কথাই মনে হয়। সমসাময়িক এবং আধুনিক অধিকাংশ লেখকই সামরিক প্রতিভার সঙ্গে-সঙ্গে বাবরের রুচি এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করেছেন। বাবর নিজেই বহু অভিযানের সময় হিন্দু মন্দির দেখে সেগুলির স্থাপত্য আর শিল্পে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর লেখাতে এক সৌন্দর্যরসিক মনের পরিচয় পাই, কোথাও একবারের জন্য কোনো মন্দির ভাঙার কথা বা নির্দেশের কথা তিনি নিজে লেখেননি। সম্পর্কে বাবরের মাসতুতো ভাই মিরজা হায়দার দুঘলাটের "তারিখ-ই-রশিদি" গ্রন্থে আছে যে, বাবর ছিলেন "নানাবিধ গুণে সমন্বিত এবং তাঁর অসংখ্য সদগুণের মধ্যে প্রধান সাহসিকতা এবং মানবিকতা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (দ্র. Ney Elias & E. Denison Ross (trs & ed), *A History of the Mughals of Central Asia :* Being the Tarikh-i-Rashidi of Mirza Muhammad Haider Dughlat; London, 1895, Indian Reprint, Academica Asiatica, Patna, 1973, pp. 173-74)। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্য ও আধুনিক ভারতের ইতিহাসের অধ্যাপক ড. সুশীল শ্রীবাস্তবের সাম্প্রতিক গবেষণায় বাবরকে ধর্মান্ধ বলা হয়নি, বরং শের সিং ও তদীয় পত্নী সুরিন্দর পুরীর মাধ্যমে আমরা বাবরকে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা ধর্মনিরপেক্ষ সম্রাটরূপেই দেখি (দ্র. *The Secular Emperor Babar,* Lokgeet Prokashan, PB 29 Sirhind, Rs. 35)

বাবরি মসজিদের খোদিত লিপিতে (তিনটি আছে, দুটি বাইরে, একটি অভ্যন্তরে) কোথাও বলা হয়নি যে ওই মসজিদ পূর্বেকার কোনো হিন্দু মন্দির ভেঙে নির্মাণ করা হয়েছে। একটি লিপিতে তো বাবরের নাম পর্যন্ত নেই। রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ সম্পর্কে বিতর্কের প্রশ্নে একটি সংবাদপত্রে 'সম্পাদক সমীপেষু' বিভাগে ইন্দ্রজিৎ দত্ত এবং আরো নজন এক পত্রে লেখেন : The inscriptions outside of the mosque above the pulpit also raise serious doubts. According to noted Urdu critic and Persian scholar, Shamsur-Rehman-Farooqui, the calligraphy and phrasing of the inscription suggest that they have been put up by someone ill versed in Persian. One inference is that the inscriptions were put up by someone after

the temple-mosque controversy began in the 19th century" (মর্মার্থ : মসজিদের বাইরের লিপি যা বেদীর উপরে আছে, সেটিও সন্দেহের উদ্রেক করে। প্রখ্যাত উর্দু সমালোচক ও ফরাসি ভাষায় পণ্ডিত সামসুর-রহমান-ফারুকির মতে, লিপির ভাষার শৈলী এবং অক্ষরচিত্র দেখে মনে হয় যে এটি কোনো ফারসি ভাষায় অপটু কোনো লোকের লেখা। একটা অনুমান এরকম যে উনিশ শতকে মন্দির-মসজিদ বিতর্ক শুরু হওয়ার পর কেউ এই কাজ করে থাকতে পারেন) (দ্র. Letter to the Editor, *The Statesman*, October 22, 1989 quoted in A. G. Noorani, "The Babri Masjid-Ram Janmabhoomi Question", in the *Economic and Political Weekly*, Nov. 4-11, 1989, pp. 2463-64).

সুতরাং আমরা ইতিহাস ঘেঁটে দেখতে পাই যে, বাবরি মসজিদের স্থানে মন্দির ভেঙে মসজিদের প্রমাণ নেই। আরো কিছু সমসাময়িক বা প্রায় সমসাময়িক সূত্র এবং সাক্ষ্য আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন, আবুল ফজলের "আইন-ই-আকবরী" (মূল রচনা ফারসি ভাষায় একখণ্ডে এটি দুখণ্ডে বিবিলিওথেকা ইনডিয়া 1867-77 খ্রী. ব্লকম্যান কর্তৃক প্রকাশিত। এর বহু ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে তিনখণ্ডে। অধিক ব্যবহৃত সং Vol. I tr. by H. Blochmann (1873), revised edn. by D. C. Phillot, Cal, 1939; Vol. II tr. by H. S. Jarrett (1891). Vol. III by H. S. Jarrett (1894), Vols. II and III revised by sir Jadunath Sarkar with further notes, Vol. II (1949), Vol. III (1948)।

"আইন-ই-আকবরী"তে অযোধ্যার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, ওই স্থানে ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র বাস করতেন, যিনি রাজা, এবং মহামানব দুই-ই ছিলেন। কিন্তু আবুল ফজল কোথাও লেখেননি যে মহামতি আকবরের পিতামহ বাবর রামচন্দ্রের মন্দির ধ্বংস করে সেই স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তা ছাড়া, আকবরের সমসাময়িক ছিলেন রামভক্ত হিন্দী কবি "রামচরিতমানস"-রচয়িতা সন্ত তুলসীদাস, যাঁকে ঐতিহাসিক ভিনসেনট স্মিথ বলেছেন 'সর্বশ্রেষ্ঠ যুগমানব' ('the greatest man of his age– greater even than Akbar himself'. V. A. Smith, *Akbar, the Great Mughal,* Oxford, Clarendon Press, 1919, p 417)। যদিও আকবরের রাজসভার দুই ওমরাহ হিন্দু রাজা মান সিং এবং মুসলমান মিরজা আবদুর রহিম খান ই তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন তবু তুলসীদাস কখনো আকবরের রাজসভায় যাননি। তুলসী অযোধ্যা অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন; ম্লেচ্ছদের উত্থান নিয়ে তিনি অনেক উদ্বেগও প্রকাশ করেন; তবু রামজন্ম-ভূমিতে মন্দির ভেঙে মসজিদ করা হয়েছে এমন কথা তিনিও লেখেননি। বস্তুত উনিশ শতকেই সর্বপ্রথম ব্রিটিশ সরকারি নথিপত্রে মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার কথা দেখা যায় এবং ওই উদ্দেশ্যপ্রাণোদিত নথি-পত্রকেই উত্তরকালে কোনো-কোনো লেখক অকাট্য প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

আসলে ধর্মনিরপেক্ষ এবং বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক বস্তুবাদী ইতিহাস-চর্চায় একথা না মেনে উপায় নেই যে মধ্যযুগের ভারতের ইসলামধর্মাবলম্বী শাসকদের অধিকাংশই ছিলেন

নিষ্ঠাবান মুসলমান, কেউ-কেউ ছিলেন উদারচেতা ও পরমতসহিষ্ণু, আবার কেউ-কেউ ছিলেন গোঁড়া এবং ধর্মান্ধ। মুসলিম শাসকগণ সর্বদাই পবিত্র হিন্দুধর্মস্থানের বিরুদ্ধে ছিলেন, এ কথা প্রমাণ করবার মতো যথেষ্ট তথ্য আমাদের হাতে নেই। অনেকে ধর্মান্তকরণে সাহায্য করেছেন, মন্দির ভাঙতে সক্রিয় প্ররোচনা দিয়েছেন—একথা যেমন সত্য, তেমনি হিন্দুদের সাহায্য করেছেন, এমনকী দেবস্থান নির্মাণেও—একথাও অনেক ক্ষেত্রে সত্য। বিস্তারিত আলোচনার পরিসর এখানে নেই, তবু উল্লেখ করা দরকার যে হিন্দু তীর্থক্ষেত্র হিসেবে অযোধ্যার বিকাশ ঘটেছিল মুসলমান নবাবদের সমর্থন পেয়েই। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, নবাবিশাসন নির্ভর করত কায়স্থদের সহযোগিতার উপরে, আর নবাবি সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ড ছিল শৈব নাগারা। নবাব সফদরজঙ্গের দেওয়ান অযোধ্যার বেশ কয়েকটি মন্দির মেরামত করতে সাহায্য করেন। স্বয়ং নবাব সফদরজঙ্গ অযোধ্যার হনুমানপর্বতে একটি মন্দির নির্মাণের জন্য জমি দান করেন। ওই অঞ্চলে মন্দির গড়তে সাহায্য করেন নবাব আসফ-উদ-দৌলার দেওয়ান। অযোধ্যার এই ঐতিহ্য ১৮৫৫ সালে নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের সময় এক উজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আসলে, ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ দমন এবং অযোধ্যা অধিগ্রহণের বৈধতা প্রমাণিত করতে চতুর ঔপনিবেশিক শাসকগণ হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সংহতি বিনষ্ট করতে তৎপর হন।

সুতরাং এই পর্ব আলোচনার পর আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, (১) বাবরি মসজিদ বাবর করেছিলেন কি না তার নিশ্চয়তা নেই, (২) মধ্যযুগে এই মসজিদ মুসলমানদের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাও নয়, (৩) মন্দির ভেঙে এখানে মসজিদ হয় তাও সত্য নয়, এবং (৪) মন্দির ভাঙার কাহিনী ছড়িয়েছে ঔপনিবেশিক শাসকেরা।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের ভূমিকা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাম্প্রতিক রামজন্মভূমি-বাবরি-মসজিদ বিতর্কের যে মূল ভিত্তি, অর্থাৎ উত্তর-প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার একটি বিশেষ মহকুমার বিশেষ গ্রামের বিশেষ মৌজার বা পরবর্তী একটি বিশেষ শহরের এটি জমির অংশের উপর মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণের কাল্পনিক কাহিনী, তার সৃষ্টি উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে। কাল্পনিক বলা হচ্ছে এই জন্য যে, এই প্রচলিত বিশ্বাস বা অতিকথনের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। মন্দির ভেঙে বাবরি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল—এরকম কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ ইতিহাস ঘেঁটে পাওয়া যায়নি। এই যে 'মিথ'টি উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে তৈরি হল, তার প্রধান উদগাতা ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসক-শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদী লেখক ও ঐতিহাসিকগণ। বিতর্ক

সৃষ্টিকারী এই কাজের পিছনে কাজ করেছিল ব্রিটিশ শাসকদের সুপরিচিত 'বিভেদ করো এবং শাসন করো'—এই নীতি এবং ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাসে মুসলিম শাসকদের 'অত্যাচারী' চরিত্রটি অতিরঞ্জিত করে হিন্দুসম্প্রদায়ের মনে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করা। কিভাবে ইংরেজদের রচনায় এই মন্দির-মসজিদ বিতর্কের পথ তৈরি করল এবং ইংরেজ লেখক-লেখিকাদের রচনার যে কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি প্রমাণ নেই—এবার সেই প্রসঙ্গ।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ঐতিহাসিক জন লিডেন বাবরের ফারসি ভাষায় লেখা আত্মজীবনীর এক অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির নাম "মেমোয়ার্স অব জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর, এমপারার অব হিন্দুস্থান"। এই গ্রন্থের অনুবাদক (ইনি ফারসি অনুবাদ থেকে ইংরিজি করেন) মন্তব্য করেন যে, বাবর পাঠানদের বিরুদ্ধে অভিযান করার সময় অযোধ্যার মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে—এটি সম্পাদক এবং অনুবাদকের অনুমান এবং ধারণা মাত্র, কোনো "সাক্ষ্যপ্রমাণ" নয়, ইতিহাসের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এমনকী স্বয়ং বাবরের মূল লেখায়ও তা নেই। ১৮১৩ খ্রী. সংস্করণ আমরা দেখিনি, তবে ১৮২৬ খ্রী. লনডনের লংম্যান কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত হয় বাবরের আত্মজীবনীর অনুবাদ যৌথ কৃত্য হিসেবে। বইটির নাম John Leyden and William Erskine (trs & ed), *Memoirs of Zahir-Ed Din-Muhammad Babar Emperor of Hindusthan, written by him self in the jaghatai Turki*। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বাবরের মাতৃভাষা ছিল চাঘাতাই বা জাঘাতাই তুর্কি। এটি ব্যবহৃত হত বাবরের মাতৃভূমি ফরগনায়। বাবরের পিতা উমর শেখ মিরজা ফরগনার ক্ষুদ্র গোষ্ঠীপতি বা সর্দার (chieftain) ছিলেন। উমর শেখ মিরজা ছিলেন তাঁর ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ আমীর তৈমুর বা তৈমুরলঙ্গের বংশধর এবং ফরগণা অঞ্চলটি একদা তৈমুরের বিশাল মধ্য-এশীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল (বর্তমানে এই ফরগনা অঞ্চল উজবেকিস্তান সোভিয়েত সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত। See, V. Pokshishevsky, *Geography of the Soviet Union*, Progress Publishers, Moscow, 1974, p 213) ফরগনাতেই বাবরের জন্ম (14 Feb, 1483), যে অঞ্চলে প্রধানত তুর্কি, কোথাও-কোথাও ফারসি ভাষার চল ছিল। John Leyden লিখেছেন বিশেষ তুর্কি উপজাতীয় ভাষা সম্পর্কে : 'It was, however, chiefly the language of the deserts and plains; as the cities especially among the Jaxartes, and to the south of the river, continued to be, in general, inhabited by persons speaking the Persian tongue'। যাইহোক, বাবরের আত্মজীবনী অনুবাদের সময় জন লিডেন কিন্তু মূল তুর্কি পাঠ অনুসরণ করেননি। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আত্মজীবনী "তুজুক-ই-বাবুরি" প্রধানত আকবরের উদ্যোগে দুবার ফারসি ভাষায় অনূদিত হয়। একবার পায়নাদা খান, একবার আবদুর রহিম মির্জা কর্তৃক এবং কেতাবটি কখনো "ওয়াকিয়াত-ই-বাবরি" বা কখনো শুধুই "বাবরনামা" নামে পরিচিত হয়। জন লিডেন অনুবাদ করেছিলেন দ্বিতীয় ফারসি অনুবাদ থেকে।

যাই হোক, জন লিডেনের অনুবাদগ্রন্থে শুধু অযোধ্যায় বাবরের উপস্থিতির কথাই মন্তব্য করা হয়েছে, যদিও প্রামাণিক সমসাময়িক তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই। বাবরের এই তথাকথিত উপস্থিতি, মীর বাকি কর্তৃক বাবরি মসজিদ স্থাপনকেই এরপর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ উত্তরকালে বিকৃত করলেন চূড়ান্তভাবে। তাঁরা এই বিশ্বাস সৃষ্টি করলেন আর প্রচার করতে শুরু করলেন যে, 'হিন্দু-বিরোধী-বাবর' রামজন্মভূমি মন্দির ধ্বংস করেছেন, এবং সেই জায়গাতেই মসজিদ তৈরি করেছেন। উনিশ শতকের মধ্য ভাগ থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের নীতির অঙ্গ হিসেবেই এই ইতিহাসবিরোধী কাজ শুরু হয়, যদিও লিডেনের বইতে মন্দির ভাঙার কোনো কথাই নেই।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য ও আধুনিক যুগের ভারতের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সুশীল শ্রীবাস্তব এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা করেছেন সম্প্রতি। আউধের ইতিহাস তাঁর গবেষণার বিষয়। তিনি গবেষণায় প্রমাণ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, কিভাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বাবরি মসজিদ-রামজন্মভূমি বিতর্কতে শুধু ইন্ধন যোগাননি, তাকে চাতুর্যের সঙ্গে কাজে লাগিয়েছেন। বিশেষত লখনউ শহরের তৎকালীন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট কর্নেল স্লীম্যান এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। কেন? সে কথা আমরা একটু পরেই আলোচনা করব।

অধ্যাপক শ্রীবাস্তবের বক্তব্যের মূল কথা ছিল এই যে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এবং তাঁদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারের ও রচনার ভিত্তিটাই ছিল জনশ্রুতি, ঐতিহাসিক ঘটনা বা প্রামাণিক তথ্য নয়। ইদানীং আশির দশকে আবার যে রামজন্মভূমি বনাম বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে অনৈতিহাসিক এবং অবাস্তব বিতর্ক তৈরি হয়েছে, এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ, সরল, অজ্ঞ, ধর্মভীরু, বিশ্বাসী অথচ ইতিহাসবিমুখ বিপুল জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে, বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলে উন্মাদনায় মোহগ্রস্ত করা হচ্ছে, সে-সম্পর্কেও ড. শ্রীবাস্তব অনুসন্ধান করে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ, যুক্তিগ্রাহ্য ও তথ্যাশ্রয়ী প্রতিবেদন পেশ করেছেন। (দ্র. Probe India, January, 1988 সংখ্যা)। তাঁর মতে, ফৈজাবাদ এলাকাটি বাবরের অধিকারের কয়েক শো বছর আগে থেকেই দিল্লী সুলতানির তুর্ক-আফগান যুগে মুসলমান শাসকদের অধিকারভুক্ত ছিল। বাবর হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়, পাঠানদের বিরুদ্ধেই অভিযান চালিয়ে ছিলেন। তখন তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যুগ এবং রাজনৈতিক কারণে পাঠানদের শেষ শক্তিক্ষয় করার কাজে তাঁর পক্ষে হিন্দুদের পক্ষে রাখাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া, 'বিতর্কিত অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে লিডেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন বলেই মনে হয়।' শ্রীবাস্তব আরো জানাচ্ছেন যে, 'বাবরি মসজিদের স্থানেই (site) রামজন্মভূমি মন্দির অবস্থিত ছিল এই বিশ্বাস (belief) প্রধানত গড়ে উঠেছে স্থানীয় বা আঞ্চলিক 'মিথ' (myth) এবং লোকশ্রুতির (folklore) উপর। বাস্তবিক পক্ষে ঐ স্থানে রামের নাম যুক্ত কোনো মন্দির আদৌ ছিল তেমন কোনো প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তেমন ধরনের কোনো মন্দিরের কথা কোনো হিন্দুশাস্ত্রের কোনো স্থানে

উল্লেখ নেই। এই বিশ্বাস গড়ে উঠেছে প্রধানত বাল্মীকির রামায়ণকে ভিত্তি করে যেখানে বলা হয়েছে 'অযোধ্যা শহরে রাম জন্মেছিলেন।' তিনি আরো বলেন যে, 'লিডেন নিজেও তাঁর বিবরণে এমন ধরনের কোনো ঘটনার কোনো উল্লেখ করেননি' অথবা বাবর 'অযোধ্যায় কোনো মন্দির ভেঙেছেন' তেমন প্রমাণও নেই। (অনুবাদগুলি বর্তমান লেখকের)

আসলে বলপূর্বক এবং অন্যায়ভাবে আউধ অধিকার (annexation of Oudh) করে নেবার আগে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ হিন্দু-মুসলমানসম্প্রীতি বিনষ্ট করে নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন। তখন উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশক। ভারতের বড়োলাট তখন উগ্র সাম্রাজ্যবাদী লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮-৫৬ খ্রী.)। ১৮৫৪ খ্রী. প্রকাশিত হল William Erskine-এর *A History of India under the two First Soverigns of the House of Taimur, Babur and Humayun* (London, 2 vols., Indian Reprint, New Delhi, 1973)। সেই বছরেই আউধেও লাগল গণ্ডগোল। আমরা আউধ কথাটি ব্যবহার করেছি, কারণ অযোধ্যা আর আউধ ঠিক এক নয়। কেন আউধে গণ্ডগোল সে কথাটি বুঝতে হলে আমাদের আউধের ইতিহাস সামান্য জেনে নিতে হবে, এবং তার জন্য পিছনে তাকাতে হবে।

আমরা আগে প্রাচীন অযোধ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। বর্তমানে মধ্যযুগ থেকে ইতিহাস পর্যালোচনা করি। ভারতবর্ষে মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণের সময়ই আউধ মুসলিম শাসকদের হাতে আসে। শিহাবুদ্দিন মুহম্মদ ঘোরীর অনুচর মালিক হিসামুদ্দিন আগ্‌হুল বাক তরাইয়ের দ্বিতীয় যুদ্ধের (১১৯২ খ্রী.) একটু পরেই ওই অঞ্চল জয় করেন। ক্রমে-ক্রমে ওই আউধ বা অযোধ্যা অঞ্চলের জমির উর্বরতা, আবহাওয়ার মনোরম ভাব, শান্ত মানুষজন, কৃষিক্ষেত্র মুসলমান শাসকশ্রেণীর মানুষদের ও সাধারণ মানুষদেরও আকৃষ্ট করে এবং তাঁরা ওই অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেন। বিশেষত সুলতান মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে (১৩২৫-১৩৫১ খ্রী.)। ওই সময় অবশ্য আউধের প্রাদেশিক শাসক আইন-উল-মূলক বিদ্রোহ করেছিলেন সুলতানের বিরুদ্ধে (১৩৪০) এবং তা দমন করাও হয়েছিল। অতঃপর আউধকে আলাদা প্রদেশ না রেখে সরাসরি দিল্লী সুলতানির অংশ করা হল এবং ওই রাজ্যের একটা অংশকে ভেঙে যুক্ত করা হল জৌনপুর রাজ্যের সঙ্গে। জৌনপুর রাজ্যের (১৩৯৯-১৪৭৬) পরে পতন হলে তাও দিল্লী সুলতানির অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বাবর ১৫২৬ খ্রী. ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করলে সমগ্র দিল্লী সুলতানি-রাজ্যের সঙ্গে আউধও তাঁর অধিকারে আসে। এই আউধ ছিল আকবরের ১৫টি সুবার অন্যতম, যা তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে ভাগ করেছিলেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) পর মুঘল সাম্রাজ্য ক্রমে দুর্বল হতে থাকে এবং ১৭২৪ খ্রী. মুঘল প্রাদেশিক শাসক সাদাত খান নিজেকে বাস্তবিক স্বাধীন সুলতান হিসেব প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর থেকে অযোধ্যা বা আউধের নবাবি শুরু হয় এবং প্রথম তিনজন নবাব ছিলেন সাদাত খান (১৭২৪-৩৯ খ্রী.), সফদরজঙ্গ (১৭৩৯-

৫৪) এবং সুজাউদ্‌দৌলা (১৭৫৪-৭৪)। বাস্তবে স্বাধীন হলেও নামে তাঁরা ছিলেন নবাব ওয়াজিব অর্থাৎ মুঘল শাসনব্যবস্থার অংশ হিসেবে প্রাদেশিক শাসক।

১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বকসারের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে একদিকে যেমন বাঙলার নবাব মীরকাশিমের শেষ স্বপ্ন ভেঙে যায়, পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭) সিরাজ-উদ্দৌলার পরাজয়ের পর ইংরেজ ঈষ্ট ইনডিয়া কোম্পানির যে ক্ষমতা পেতে শুরু করে, বকসার জয়লাভ তার পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দেয়, তেমনি অযোধ্যা বা আউধের নবাবদের পতনেরও সূচনা বহন করে। বণিকের মানদণ্ড হাতে নিয়ে সুড়ঙ্গপথের অন্ধকারে প্রবেশ করে অর্থলোভী ইংরেজ এবং রাজদণ্ড হাতে দেখা দেয় অচিরেই—১৭৬৫ খ্রী. ক্ষয়িষ্ণু মুঘল রাজশক্তির প্রতিনিধি সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্‌ আলমের কাছ থেকে বাঙলার দেওয়ানি লাভ করার পরেই। দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস আসার সঙ্গে-সঙ্গে ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানির শাসন শুরু হয়ে গেল। এই ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের ধ্যানজ্ঞান হল রাজস্বের মাত্রাবৃদ্ধি, যেনতেন প্রকারেণ মুনাফা অর্জন, অনুগত শ্রেণী ও সহযোগী শ্রেণী ভারতীয়দের মধ্যে গড়ে তোলা, ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো সুদৃঢ় করা এবং ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত করা। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলেই ১৭৭৪ খ্রী. আউধ ব্রিটিশদের সাহায্য নিয়ে রোহিল-খণ্ড অঞ্চল দখল করে এবং নবাব নিজেদের শাসন বজায় রাখতে সমর্থ হয়। সুজাউদ্দৌলার পুত্র ও উত্তরাধিকারী অসফ্‌-উদ-দৌলার আমলেই (১৭৭৫-১৭৯৭) সাম্রাজ্যলোভী ও ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী উদীয়মান ব্রিটিশ শক্তির নজর পড়ে আউধের উপর। কারণ, ওই রাজ্য তাদের বাঙলা-বিহার রাজ্যের ও মারাঠাদের রাজ্যের মধ্যে সেতুস্বরূপ; সুতরাং ওইটি গ্রাস করা দরকার। সুতরাং ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানি ধুয়ো তোলে যে নবাবের অধীনে আউধে অপশাসন জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ। ১৭৯৭ খ্রী. আসফউদদৌলার মৃত্যুর পর তাঁর অবৈধ সন্তান-ওয়াজিদ আলি কিছু দিনের জন্য (১৭৯৭-৯৮) নবাব হলেও কোম্পানি নিজেরাই এগিয়ে এসে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করলেন এবং আসফউদদৌলার ভাই সাদাত আলিকে নবাব করলেন। বলা বাহুল্য, কোম্পানি এই সহায়তার কথা নতুন নবাব ভুললেন না। সাম্রাজ্যবাদী ও কূটকৌশলী লর্ড ওয়েলেসলি তখন বড়লাট (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রী.)। কৃতজ্ঞ নবাব সাদাত আলি ক্ষমতায় ছিলেন ১৭৭০ থেকে ১৮১৪ পর্যন্ত। তার মধ্যে তিনি কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে এক চুক্তি করে ফেললেন প্রথমেই, যার দ্বারা তিনি এলাহাবাদ দুর্গ কোম্পানিকে দিয়ে দিলেন, কোম্পানিকে বাৎসরিক ৭৬ লক্ষ টাকা সাহায্য দিতে স্বীকৃত হলেন, এবং ইংরেজ ছাড়া অন্য কোনো বিদেশী শক্তির সঙ্গে যোগাগোয করবেন না—এমন কথাও দিলেন। পরিবর্তে কোম্পানি আউধকে রক্ষা করবে, সীমান্ত সুরক্ষিত থাকবে। অধীনতামূলক মিত্রতার চমৎকার দৃষ্টান্ত। আউধ কোম্পানির চালে নিজ গৌরব এবং ক্ষমতা হারাল। ১৮০১ খ্রী. কোম্পানি আউধকে তাদের রোহিলখণ্ড এবং

গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী বা নিম্ন দোয়াব অঞ্চল দিতে বাধ্য করল। নবাবের হাতে অল্প অংশই রইল। যদিও লর্ড হেস্টিংস ১৮১৯ খ্রী. সাদাত আলির উত্তরাধিকারী এবং পুত্র গাজিউদ্দিন হায়দারকে (১৮১৪-২৭) 'রাজা' উপাধি দিলেন, নবাবের কিংবা রাজ্যের ক্ষমতা তাতে বাড়ল না। বরং কোম্পানির মতে আউধে নবাবগণ শাসনে অযোগ্যই রইলেন এবং কোম্পানি কোনো ছলে বা ছুতোয় সম্পূর্ণ রাজ্য গ্রাস করার তাল খুঁজতে লাগলেন। এভাবেই চলতে লাগল হায়দারের উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকাল, যথাক্রমে নাসিরুদ্দিন হায়দার (১৮২৭-৩৭), আলি শাহ (১৮৩৭-৪২), আমজাদ অলি শাহ (১৮৪২-৪৭)।

এই ওয়াজেদ আলি শাহের আমলেই 'অপশাসনের অজুহাতে' কোম্পানি অউধকে নবাবি শাসনমুক্ত ক'রে আনুষ্ঠানিকভাবে কোম্পানির বা ব্রিটিশ ভারতের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। নবাব নাকি প্রজাদের মঙ্গল দেখতেন না, কেবল বসে আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাতেন। আর 'শতরঞ্জ' খেলতেন। শুধু তাই নয়, ওয়াজেদ আলি শাহের আমলে বাবরি মসজিদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল, রামজন্মভূমির কল্পকাহিনী—যাতে নবাবের রাজ্যের অন্তর্গত হিন্দু প্রজারা সাধারণ মুসলমানদের সম্পর্কে এবং বিশেষত নবাবি শাসন সম্পর্কে বীতস্পৃহ হয়, এবং 'যবন'-শাসনমুক্ত হয়ে ব্রিটিশ রাজের অন্তর্গত হতে সাহায্য করে। এই ব্যাপারে প্রধান পাণ্ডা ছিলেন স্যার উইলিয়াম স্লীম্যান যিনি একদা লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিকের আমলে 'ঠগী' দমন করে নাম কিনেছিলেন। স্লীম্যান লখনউ নগরীতে ব্রিটিশ সরকারের রেসিডেন্ট ছিলেন (১৮৪৮-৫৪ খ্রী.)। তাঁর প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কোম্পানি আউধ অধিকার করার ব্যাপারে সক্রিয় হয়। পরবর্তী রেসিডেন্ট স্যার জেমস উটরাম (Qutram) ছিলেন শ্লীম্যানেরই পথের পথিক, এবং তাঁর কার্যকালেই আউধ কোম্পানি দখল (annexation) করে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। আমরা কর্নেল্ শ্লীম্যানের ভূমিকার কথা আগে একবার সামান্য উল্লেখ করেছি। এই সাম্রাজ্যবাদী শাসকের আমলেই অযোধ্যায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলা হয় এবং হিন্দু জনসাধারণের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে, বাবর যে মসজিদ তৈরি করেছিলেন (যদিও আমরা দেখেছি যে বাবর যে মসজিদ করেছিলেন— তেমন কোনো জোরালো সাক্ষ্য নেই) তা রামজন্ম-ভূমিতেই শুধু নয়, সেখানকার মন্দির ভেঙে (যদিও আমরা দেখেছি যে এখানে যে আদৌ কোনো মন্দির ছিল, তার কোনো প্রমাণ নেই)। জন লিডেন, উইলিয়াম আরস্কাইন প্রমুখের বই তারা বিকৃত করতে শুরু করে। জনগণের মধ্যে বিরোধ ক্রমে উগ্র রূপ ধারণ করে, এবং তার অবশ্যাম্ভাবী পরিণতি হিসেবে দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এটা ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

১৮৪৮-৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে জমি তৈরি হয়েছিল, তারই ফসল ফলল ১৮৫৫-তে। যত প্রজাদের মধ্যে বিবাদ হবে, যত হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হবে, যত আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হবে, ততটাই ব্রিটিশ রেসিডেনটের পক্ষে আইন (law and order) ও শাসনের ধুয়ো তুলে ব্রিটিশ বড়লাটকে আউধ দখল করে নিতে বলা সহজ হবে। তদুপরি, যদি এক

সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় নিরাপত্তার অভাববোধ করেন, তাহলে তাঁদের স্বার্থে ইংরেজদের রাজ্য দখল আরো যেন বৈধতা (legitimacy) প্রাপ্ত হবে। বাবরি মসজিদসংলগ্ন যে স্থানে রামের জন্মভূমি বলে (আবার কোনো-কোনো জনশ্রুতি অনুসারে রামচন্দ্রের পত্নী সীতার রান্নার জায়গা বা 'রসুইঘর' ছিল ওইখানেই) দাবি করা হয় (Ram Chabutara), সেই স্থানেও স্লীম্যানের আমলে রীতিমতো পুজা শুরু হয়ে যায়, এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৫৫ খ্রী. হিন্দু সম্প্রদায় সমগ্র মসজিদ এলাকাটি দাবি করলে সংঘর্ষ বাধে। লক্ষণীয় যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের মূল ঘাঁটি ছিল মসজিদটি, অপরপক্ষে হিন্দুদের ঘাঁটি ছিল নিকটবর্তী হনুমানগড়ি (হনুমান পাহাড়ে যেখানে গড় ও মন্দির গড়ে উঠেছিল আউধের নবাবি আমলে)। শেষ পর্যন্ত প্রশাসন এই সংঘর্ষ আর দাঙ্গা দমন করে।

এই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে অস্থায়ী সেটলমেন্ট অফিসার মিলেট (A. F. Millet) জানিয়েছিলেন : 'এটাই বলা হয়ে থাকে যে, ওই সময় (১৮৫৬-এর দাঙ্গা) পর্যন্ত হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ই মন্দির/মসজিদে উপাসনা/পুজা করত। তারপর ব্রিটিশ প্রশাসন বিতর্ক এড়াবার জন্য একটা রেলিং তৈরি করে দেয়, যার মধ্যেও যার ফলে মুসলমানরা মসজিদে উপাসনা করতে পারে, অন্যদিকে বেড়ার বাইরে হিন্দুরা একটি বেদী/মঞ্চ তৈরি করে যাতে তারা পূজার্চনা দিতে পারে।' (বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের। মিলেটের উদ্ধৃতির জন্য দ্র, Kanchan Gupta, "Storm over Ayodhya" in the *Sunday Statesman* Miscellany, 5 Nov, ১৯৮৯ সংখ্যা)। আসলে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের দাঙ্গার পর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের উদ্দেশ্য অনেকটাই সাধিত হয়। অথচ ফৈজাবাদের ঐতিহ্যই ছিল হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কখনো বিরোধ ছিল না বা সংঘর্ষ হয়নি, সেকথা যেমন ইতিহাসসম্মত নয় তেমনি সর্বদাই সংঘর্ষ হত—তাও ঠিক নয়। বিরোধও ছিল, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও ছিল। উভয় সম্প্রদায়ের বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষের মধ্যে সদ্ভাবই ছিল বেশি। ওয়াজেদ আলি শাহের আমলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ হলে নবাব একদেশদর্শী হয়ে মুসলমানদের পক্ষ অবলম্বন করেননি। জেলা প্রশাসক, নেতৃস্থানীয় হিন্দু জমিদার ও কোম্পানির ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করেও যখন সাম্প্রদায়িক শক্তিদের নিয়ন্ত্রণ করা গেল না, তখন ওয়াজেদ আলি শাহ মুসলিম জনসমর্থন সংগ্রহ করে সাম্প্রদায়িক সুন্নী মুসলমানদের নেতা মৌলবী আমীর আলির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন ও পরে সেনাবাহিনীর সাহায্যে সুন্নী মুসলিম গোষ্ঠীর বাধা চূর্ণ করলেন। তবু ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যলোভী ও মুনাফাখোর কোম্পানি সরকার আউধ অধিগ্রহণ করলেন সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে। লর্ড ডালহৌসির পর এলেন লর্ড ক্যানিং।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এই জবরদস্তি পরের বছর ভারত জুড়ে মহাবিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গে আউধেও দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। ১৮৬০-এর পর থেকে দেখা গেল ব্রিটিশ সরকারি নথিপত্রে এবং ইতিহাসচর্চায় বাবরি মসজিদ এবং রামজন্মভূমি বিতর্কিত স্থান

বলে উল্লেখ করা শুরু হয়। শুধু তাই নয় মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার কাহিনী সরকারি নথি বা দলিলেও স্থান পায়।

ফৈজাবাদ জেলার তৎসাময়িক (officiating) কমিশনার ও সেটল্‌মেন্ট অফিসার কার্নেগি (P. Carnegy) অযোধ্যার এক বিস্তৃত ইতিহাস লেখেন তাঁর *A Historical Sketch of Fyzabad Tehsil, including the Former Capital Ayodhya and Fyzabad* গ্রন্থে। এটি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই 'ইতিহাস' সর্বদা সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর নির্ভরশীল তো নয়, বহুস্থানে লেখক জানিয়েছেন তাঁর বক্তব্য ও সিদ্ধান্তের ভিত্তি স্থানীয় মানুষদের মত ও বিশ্বাস (locally affirmed)। এই ব্যাপারে কোনো রকম অনুসন্ধান না করে, ইতিহাসের প্রমাণ আছে কি না, তা না দেখেই মন্দির ভাঙার কাহিনীটি লিপিবদ্ধ হয়ে গেল। দুই উদাহরণ দিচ্ছি। পি. কার্নেগি লিখেছেন যে অয়োধ্যায় 'জন্মস্থানে অন্তত সুন্দর একটি মন্দির ছিল' (Ayodhya 'must *at least have possessed a fine temple* in the Janmasthan'। বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের)। অন্যত্র লিখেছেন, 'এটা মনে হয় যে বাবর ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যা পরিদর্শন করেন এবং তার নির্দেশেই এই প্রাচীন মন্দিরটি ধ্বংস করা হয়' ('It seems that in 1582 Babar visited Ayodhya and under his orders this ancient temple was destroyed'। বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের, বাঁকা হরফও। তবে তাঁর এই 'মনে হওয়ার' কোনো সমসাময়িক ঐতিহাসিক পাথুরে প্রমাণ লেখক হাজির করেননি। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের নথিতেও একই ধরনের কথা ঢুকে যায়। এবং নেভিল সাহেব (H. R. Neville) ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে যে ফৈজাবাদ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার সংকলন করেন (এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত) সেখানেও দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ বাবরি মসজিদ রামজন্মভূমিকে সমগুরুত্ব দিয়েছেন এবং মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার কাহিনী সম্পূর্ণ সমর্থন করেছেন। এইভাবে ১৮৫৬ খ্রী. আউধ অধিগ্রহণের পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই ব্রিটিশ শাসকদের সরকারি নথি বা প্রতিবেদনে রামজন্মভূমি মন্দির ভেঙে বা অংশত ভেঙে মসজিদ গড়ার কাহিনী 'ইতিহাস' রূপে স্বীকৃতি লাভ করে।

ঔপনিবেশিক ভারতে সরকারি দলিল-দস্তাবেজের মতোই, ইতিহাসগবেষণা ও ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রেও সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকগণ নিজস্বার্থে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে ভারত-ইতিহাসের এক সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা শুরু করেন, ক্রমে তা বিস্তার লাভ করে, নব্যশিক্ষিত ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর তার প্রভাব পড়ে এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ভাষ্য প্রভাব ফেলে। আমাদের দেশের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতাবাদী গোষ্ঠীগুলি ও মৌলবাদী নেতৃত্বও ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা করেছেন অনেকটা মনোমতো ইচ্ছানুসারে, যদিও ইতিহাসের তথ্যনিষ্ঠ বিচারে তার অনেক কিছুই ধোপে টেঁকে না। সবচাইতে বড়ো কথা, ভারতীয় ঐতিহাসিকগণেরও এক অংশ অজ্ঞানত বা কখনো-কখনো সচেতনভাবেই ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের প্রদর্শিত পথ গ্রহণ করেন, এবং

ভারত-ইতিহাসের পঠন-পাঠনে সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যায় ইন্ধন যোগান। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ধর্মনিরপেক্ষ এবং বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচর্চা আমাদের দেশে প্রাধান্য পায় এবং বর্তমানে আমরা অতীতের বহু ধারণা সঙ্গত কারণে সংশোধন করতে বাধ্য হয়েছি। এই অনুচ্ছেদের বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা বর্তমানে আমাদের প্রাসঙ্গিক নয়, তার পরিসরও নেই। (আমি এ-বিষয়ে অন্যত্র বহু আলোচনা করেছি। দ্র. "ইতিহাসপাঠ এবং সাম্প্রদায়িকতা", দেশ, ৫১ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা, ২৮ জুলাই, ১৯৮৪; "প্রসঙ্গ : সাম্প্রদায়িকতা ও ভারতের ইতিহাস", **ইতিহাসচর্চা : জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা** (সম্পাদনা গৌতম চট্টোপাধ্যায়), কে.পি. বাগচী, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৮২-১১৫ এবং "ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ইতিহাসচর্চা", **শুভশ্রী**, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৮৯। অপিচ দ্রষ্টব্য Bipan Chandra, *Communalism in Modern India*, New Delhi, 1984)।

আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ে শুধু দুটি কথা সংক্ষেপে হলেও বলা দরকার। প্রথমত, আগের অনুচ্ছেদে আমরা যে ঔপনিবেশিক যুগের ইতিহাসচর্চার কথা বলেছি তা সরকারি প্রতিবেদন বা গেজেটিয়ার বা অন্যান্য দলিলের মতো রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ প্রশ্নেও নতুন মাত্রা যুক্ত করে। আমরা John Leyden এবং William Erskine-এর বাবর সম্পর্কে বইয়ের (১৮২৬) কথা আগেই উল্লেখ করেছি। জেমস্ মিল এবং মার্শম্যান যে ভারত ইতিহাসচর্চার ধারা শুরু করেন তা জোর পায় মাউণ্ট স্টুয়ার্ট এলফিনস্টোনের *History of India* প্রকাশিত হওয়ার পর (১৮৫৭)। ঔপনিবেশিক যুগের গোড়ার দিকে যে প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বচর্চার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল, মুখ্যত ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদদের (Orientalist) চেষ্টায়, সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতের মধ্যযুগচর্চা বৃদ্ধি পায়। উনিশ শতকের ষাট এবং সত্তরের দশকে প্রকাশিত হয় ইলিয়ট এবং ডাউসনের (H. Elliot & J. Dowson) সুপরিচিত আট খণ্ডে History of India as told by its own historians, যাতে বহু আরবি-ফারসি কেতাব প্রকাশিত হয়। William Erskine তাঁর বাবর-হুমায়ুন সম্পর্কে বই দুখণ্ডে প্রকাশ করেন লনডন থেকে *A History of India under the First Two Sovereigns of the House of Taimur, Babar and Humayun* নামে। J. T. Wheeler লেখেন *India under the Muslim Rule—Political, Historical and Social Integration* (London, 1875, Reprint Delhi, 1975) H. G. Keene লেখেন *Turksin India* (1879)। বদায়ুনী অনুবাদ করেন র‍্যানকিং, লো, হেগ; আবুল ফজল অনুবাদ করেন ব্লকম্যান, 'দবিস্তান-ই-মজাহিব' অনুবাদ করেন ডেভিড শিয়া ও অ্যাণ্টনি ট্রয়ার। 'হুমায়ুননামা' করেন অ্যানেট বেভারিজ, 'তুজুক ই জাহাঙ্গিরী' করেন রজার্স ও হেনরি বেভারিজ; জৌহর অনুবাদ করেন চালর্স টুয়ার্ট, আলবিরুনী অনুবাদ করেন এডওয়ার্ড সাচাউ; মিনহাসউদ্দিন সিরাজ অনুবাদ করেন মেজর জি. এইচ. ব্যাভার্টি; এবং এলিয়াস ও ডেনিসন রস ভাষান্তর করেন 'তারিখ-ই-রশিদি' ইত্যাদি। আবার বাবরের আত্মকথার

অনুবাদ ও জীবনীও ছাপা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলি হল—Stanley Lane-Poole, *Memoirs of Babar, Emperor of India, First of the Great Moghuls,* London, 1909; L. F. Rushbrook Williams, *An Empre-builder of the Sixteenth Century* (Allahabad University Lectures, 1915-16, London, 1918) এবং Annette Susannah Beveridge, Babar *Name (Memoirs of Babar),* 2 vols, London, 1922। যদিও অ্যানেট বেভারিজ ফারসি অনুবাদ নয়, মূল তুর্কি থেকেই অনুবাদ করেন এবং প্রথমে চার কিস্তিতে লনডনের *Journal of the Royal Asiatic Society* পত্রিকায় প্রকাশ করেন (যথাক্রমে, জুন ১৯১২, মে ১৯১৪, অকটোবর ১৯১৭ এবং সেপটেমবর ১৯২১), গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করার সময় সম্পাদকীয় টীকা ও নিজের মন্তব্য যোগ করেন যার মধ্যে বাবরি মসজিদ প্রসঙ্গে মন্দির ভাঙার প্রচলিত লোককাহিনীকে ইতিহাস হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এই ধরনের ইতিহাস-বিকৃতির কুফল ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যেও পড়েছে। একটিমাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। শ্রীরাম শর্মা তাঁর *The Religious Policy of the Mughal Emperors* (Asia Publishing, Bombay, 3rd revised edn, 1972) মন্তব্য করেছেন 'By Babur's orders, Mir Baqi destroyed the temple at Ayodhya commemoration Rama's birthplace and built a mosque in its place in 1528-29' (পৃ. ২৪)। কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই মন্তব্যের সমর্থনে না দিয়ে স্পষ্টতই সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিক শ্রীরাম শর্মা U. P. Historical Society-র জার্নালে ১৯৩৬ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ গৌণ সূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সুতরাং ব্রিটিশ সরকারি নথিপত্রের মতো সাম্প্রদায়িক এবং সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসচর্চারও কুফল পরবর্তী কালে বিতর্কে সহায়ক হয়েছে। উনিশ শতকের শেষদিকে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে (Vol. XLIV, Pt I, Nos I-V, 1875) 'অযোধ্যা মাহাত্ম্য' নামক এক অর্বাচীন সংস্কৃত তীর্থযাত্রী-সহায়িকা গ্রন্থের ইংরিজি অনুবাদ ছাপা হয়। এর ঐতিহাসিকতা না থাকা সত্ত্বেও ঐ মাহাত্ম্যেও বলা হয় যে মসজিদের কাছে কোনো এক স্থানে রামের জন্মস্থান।

দ্বিতীয়ত, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের ভূমিকার ফলেই সরকারি দলিলে এবং ইতিহাসে সাক্ষ্যপ্রমাণহীন বিকৃতি ঢুকে যে 'মিথ' সৃষ্টি করে, তা ব্রিটিশ বিচারবিভাগ পর্যন্ত গিলতে বাধ্য হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মোহান্তের মামলায় সাব-জজ, ফৈজাবাদের জেলা জজ কর্নেল J. E. A. Chambier এবং পরে আপিল হলে Judicial Commissioner ১৯৮৬ খ্রী. W. Young যে ভিন্ন-ভিন্ন রায় দেন সেগুলিতে মন্দির নির্মাণের অনুমতি না দেওয়া হলেও মসজিদ স্থানের নিকটেই যে রামজন্মভূমি এবং সীতার রান্নাঘর এবং মন্দির ভেঙে যে মসজিদ হয়েছে, সে সব কথা মেনে নেওয়া হয়। (মামলার বিস্তারিত ইতিহাসের জন্য S. K. Tripathi-র লেখা দ্রষ্টব্য। *Indian Express* দিল্লী, মার্চ ৩০, ১৯৮৬)।

উপসংহার

পূর্বোক্ত পর্যালোচনা সবিস্তারে করার পর আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে :

১. বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত অযোধ্যা আর বর্তমান অযোধ্যা যে এক, তার প্রমাণ নেই।

২. রাম মহাকাব্যের নায়ক, ঐতিহাসিক চরিত্র নন। কিংবদন্তী অনুসারে রামকে মানলেও কোন্ স্থানে তাঁর জন্ম, তা বলার মতো প্রমাণ নেই।

৩. রামজন্মভূমির স্থান যেমন নির্দিষ্ট নয়, তেমনি সেই স্থানে মন্দির ছিল, একথারও কোনো প্রমাণ নেই।

৪. বাবর যে বাবরি মসজিদ তৈরি করেছিলেন, তার প্রমাণ নেই।

৫. বাবর মন্দির ভেঙে মসজিদ করেছেন কিনা,তারও প্রমাণ নেই।

৬. অযোধ্যা নানা যুগে নানা ধর্মের পবিত্র স্থান, একক কোনো সম্প্রদায়ের নয়।

৭. ঔপনিবেশিক যুগে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা, ঐতিহাসিকরা, বিচারকরা মিলে নিজস্বার্থে রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতর্ক সৃষ্টি করে; এবং সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ সৃষ্টি করে।

আমাদের পর্যালোচনা থেকে আরো স্পষ্ট যে ভারত-ইতিহাসের যে সাম্প্রদায়িক ভাষ্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীরা করে থাকেন, নির্মোহ ধর্মনিরপেক্ষ ও বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস বিচারে, সত্য ও তথ্য-নিষ্ঠার নিরিখে তা ধোপে টেঁকে না। পবিত্র ধর্মস্থান হিসেবে অযোধ্যার একটি পরিবর্তনশীল রূপই ইতিহাসে দেখা যায় প্রাচীনকাল থেকে। বহু ধর্মের সঙ্গেই তা যুক্ত। সুতরাং কোনো এক সম্প্রদায় আজ অযোধ্যা দাবি করতে পারে না। রামজন্মভূমি ও বাবরি মসজিদ নিয়ে যে বিতর্ক শুরু হয়েছে এবং আশির দশকে মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে তা হয়েছে ইতিহাসকে বিকৃত করে আপন মনের মতো সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার ফলে। অথচ ভারতবর্ষের মতো বহু ধর্ম-জাতি-ভাষা-বর্ণের সমাজে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ দৃষ্টিতে ইতিহাসকে আত্মসাৎ করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হলে তার ফল হবে মারাত্মক। বিনষ্ট হবে সংহতি এবং সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের বর্তমান প্রচেষ্টা; আত্মঘাতী দাঙ্গা ও হানাহানি ও বিচ্ছিন্নতার ফলে প্রগতির পথ হবে রুদ্ধ। তাই আমাদের দেশে যাঁরা ইতিহাসনিষ্ঠ এবং সেকুলার মানুষ তাঁদের সকলের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ যেন এই সমস্যার সমাধান হয়। সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলি যেন রাজনৈতিক সমাধান করেন। মসজিদে নামাজ পড়ার অনুমতি বা মন্দির গঠনের অনুমতি না দিয়ে সরকার যেন জাতীয় সংরক্ষিত যৌথ (Protected National Monument) হিসেবে এটি রক্ষা করেন। সীমারেখা টেনে উভয় সম্প্রাদায়ের সৌধ থাক এবং বজায় থাক ভারতের মানবিক উদার ঐতিহ্য।

চতুরঙ্গ ১৯৯০